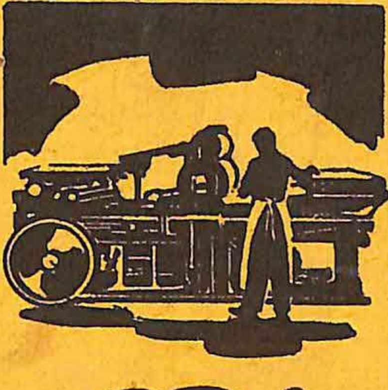
আকর ও হস্ত শিল্প



মুদ্রণ বিশারদ

অশোক ঘোষ

আমরাও হতে পারি

দ্বিতীয় বই

অশোক ঘোষ

মুদ্রণ-বিশারদ

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : অগাস্ট, ১৯৫৫

প্রকাশক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, স্বাক্ষর লিমিটেড,
১১বি চৌরঙ্গি টেরাস, কলকাতা-২০

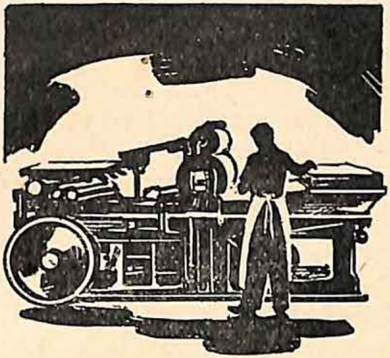
মুদ্রাকর নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বপ্না প্রেস লিমিটেড,
৮/১ লালবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-১

ব্লক তৈরী : স্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং কোঃ
১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯

বাঁধাই : ওরিয়েন্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১০০ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট : খালেদ চৌধুরী
ভিতরের ছবি : মণীন্দ্র মিত্র, অমূল্য দাশ

দাম : আড়াই টাকা



মুদ্রণ বিশারদ

অশোক ঘোষ

॥ স্মরণীয় ॥

বাঙলা মুদ্রণের পথিকৃৎ

উইলিয়ম কেরি

পঞ্চানন কর্মকার

মনোহর কর্মকার

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

হাফটোন স্ক্রীনের বৈচিত্র্যসাধনে যাঁর প্রতিভা বিশ্ব-স্বীকৃত

সুরেশচন্দ্র মজুমদার

বাঙলায় লাইনো-মুদ্রণকে যিনি সম্ভব করেন

দশে মিলি

একতাল মাটি নিয়ে বসেছে কুমোর। কী গড়বে সে? সেটা আগে থাকতে মনে-মনে ঠিক করে নিতে হবে। নইলে শিব গড়তে গিয়ে যদি বাঁদর গড়ে বসে?

কী সেলাই করছে বুড়ি দিদিমা ছুঁচসুতো নিয়ে? একখানা নকশি কাঁথা বুঝি? কোলের নাতিটির জন্যে?

কী লেখে তোমার মামু চিলেকোঠায় একা বসে-বসে? তাকে বুঝি কবিতা-লেখায় পেয়েছে আজকাল?

যে যাই করুক, আগে ভে বে নিতে হবে কী করতে চাই: কী মূর্তি, কী নকশা, কী ভাব ফুটিয়ে তুলতে চাই। আগে ভেবে নিতে হবে, তবে কাজ এগোবে।

মূর্তি-গড়া, নকশা-সেলাই, কবিতা-লেখা—প্রত্যেকটাই এক-হাতের কাজ, এক-মনের ভাবনা।

কিন্তু কবি যদি মনে করে তার কবিতা এখন পাঁচ-কানে তোলবার উপযুক্ত হয়েছে? তখন তাকে বই ছাপাতে হবে।

এই বই লেখার ব্যাপারে আমরা নানান জনের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের প্রত্যেককে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

আদর্শ প্রেস কপির নমুনা হিসেবে মুদ্রিত পৃষ্ঠাটি শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর 'মহাভারত সারানুবাদ'-এর পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি।

সচিত্র পৃষ্ঠার নমুনা হিসেবে উদ্‌ধৃত যুগ্ম-পৃষ্ঠা দুটি বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ' আর অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'নদীপথে' থেকে গৃহীত।

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু ও বিশ্বভারতীর শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেনের কাছে আমরা এজন্য কৃতজ্ঞ।

ষ্ট্যান্‌ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং কোম্পানির অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হীরালাল সেনগুপ্ত, মেট্রোপলিটান প্রিন্‌টিং অ্যান্‌ড্‌ পাব্‌লিশিং হাউস্‌ লিমিটেডের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শিল্পী শ্রীযুক্ত দেবব্রত মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ দাশ এই বই লেখার ব্যাপারে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। আমরা এঁদেরও ধন্যবাদ জানাই।

কবিতা-লেখা এক-হাতের কাজ, কিন্তু কবিতার-বই-ছাপা তা নয়—

বই-ছাপা দশ-হাতের কাজ।

নানা-হাতের আর্টের কথা উঠতেই সিনেমার কথা মনে পড়ে গেলো।

সিনেমার ছবি তৈরি করতে হলে এক-একজনকে এক-এক কাজ নিয়ে লেগে থাকতে হয়। কেউ চিত্রনাট্য লেখেন, কেউ ফোটো তোলেন, কেউ শব্দ ধরে রাখেন, কেউ দৃশ্যপট তৈরি করেন, কেউ গানে সুর দেন। যিনি যাই করুন, নিজের কাজটুকু মন দিয়ে করেন। আমার কাজটুকু নিখুঁত যেন হয়, এই প্রত্যেকের চিন্তা।

নানা জনের নানা কাজ মিলিয়ে তৈরি হয়ে ওঠে একখানি সিনেমার ছবি।

সিনেমায় সেইজন্যে এমন একজনের দরকার হয় যিনি গোটা ছবিটার কথা সব সময়ে মনে রাখবেন, দশ জনের দশ রকমের কাজকে একসূত্রে গাঁথবেন—দশ কাজ মিলিয়ে গোটা এ ক টা জিনিস যেন তৈরি হয়,—নানান জাতের নানান রঙের ফুল মানিয়ে-মিশিয়ে মালি যেমন গাঁথে সুন্দর একখানি মালা।

সিনেমায় এই মেলাবার মানুষটি হলেন পরিচালক।

সিনেমার মতো বই-ছাপাও নানা-হাতের শিল্প। কেউ হরফ গাঁথেন; কেউ ধাতুর পাতে ছবির নকল তোলেন, কেউ গাঁথা হরফ আর ছবির পাত মেশিনে চড়িয়ে কাগজের ওপরে তার

ছাপ তোলেন, কেউ-বা ছাপা আলগা কাগজগুলোকে সেলাই করে বেঁধে ফেলেন। পর-পর এই নানান ধরনের কাজগুলো শেষ হলে তবেই তোমার মাতুলের মনের কথা সেই-সুখে-সুখী-সেই-দুখে-দুখী আর-পাঁচজনের কাছে পৌঁছবে।

সিনেমার মতো বই-ছাপার শিল্পেও একজন মেলাবার মানুষ চাই। তাঁর নাম কী ? বিলেতে বলে টাইপোগ্রাফার। আমেরিকায় বলে ডিজাইনার। বাঙলায় এখনো কোনো নাম তৈরি হয় নি। কাজ চালাবার জন্যে একটা নাম বানিয়ে নিলে হয় না ?

['মুদ্রক' নাম দিলে কেমন শোনায় ?

বেশ শোনায়। তোমাতে-আমাতে আপাতত এই নামই চালানো যাক। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো—বাঙলায় আজকাল মুদ্রাকরকেও মুদ্রক বলা হচ্ছে। মুদ্রাকর কিন্তু টাইপোগ্রাফার নন—প্রিন্টার, যাঁর নামে সরকারের কাছ থেকে ছাপাখানা খোলার অনুমতি নেওয়া হয়, অন্যায় কিছু ছাপলে যাঁর কাছ থেকে সরকার কৈফিয়ত তলব করে। ছাপার ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গ না জেনেও প্রিন্টার হওয়া চলে—

[কিন্তু আমাদের পরিভাষার 'মুদ্রক' হওয়া চলে না।

ঠিক বলেছো।

[মুদ্রকের কাজটা কী বলুন? মুদ্রক হতে হলে কী কী গুণ থাকা চাই ?

মুদ্রকের সবচেয়ে বেশি যে-গুণটি থাকা চাই সেটি হলো—ক ল্প না শ ক্তি।

বলা যেতে পারে, এইটাই হলো মুদ্রকের সর্বপ্রধান গুণ। তোমার কবি-মামার কবিতার খাতাখানি হাতে নিয়ে পাতা উলটে যেতে-যেতে ছাপা বইখানার গোটা চেহারাটা তোমার কল্পনায় ভেসে ওঠা চাই—ছাপা হবার আগেই, ছাপার পর যেমন দেখাবে ঠিক তেমনটি দেখতে পারা চাই। তবেই বলবো তুমি মুদ্রক হতে পারবে।

লেখা পাতার ওপর চোখ বোলাতে-বোলাতেই চোখের সামনে দেখতে পাওয়া চাই :

ছাপা পাতা লম্বায়-চওড়ায় কী মাপের হবে ;

ছাপা পাতার কতোটুকু আর ঠিক কোনটুকু জায়গায় কালির ছোপ লাগবে ;

ওপরে-নিচে ডাইনে-বাঁয়ে কোনখানে কতোটুকু করে আছাপা শাদা জায়গা থাকবে ;

কোন ছাঁদের কোন মাপের হরফে বই ছাপা হবে ;

ছাপা লাইনের মাঝে-মাঝে কতোটুকু করে ফাঁকা জায়গা থাকবে।

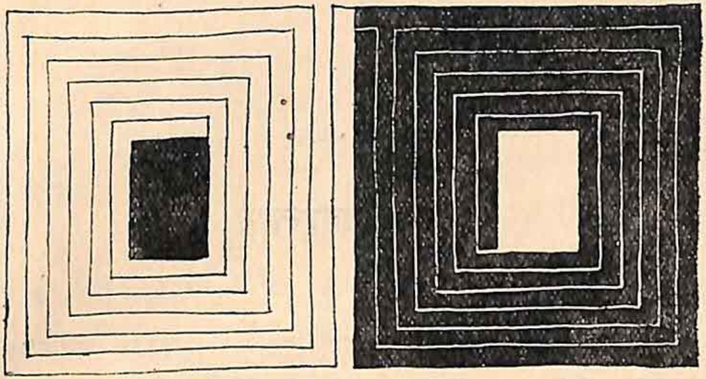
[বেশ পরিষ্কার বুঝলাম। মুদ্রক হতে হলে আর কী কী গুণ থাকা দরকার ?

আগেই বলেছি, বই ছাপা নানা-হাতের কাজ। যাঁদের হাতের কাজে হাতে-লেখা খাতাখানি ছাপা বই হয়ে উঠবে তাঁদের প্র ত্যে কে র কাজের ধরনটি, নিয়ম-নীতিটি একেবারে নখদর্পণে থাকা দরকার, মাপজোপগুলো ঠোঁটস্থ থাকা দরকার।

মুদ্রক হতে চাইলে তোমার জানা দরকার—

- কতো রকমের আর কতো মাপের কাগজ আছে ;
- কতো রকমের, কতো ছাঁদের আর কতো মাপের ছাপার হরফ আছে ;
- কী করে দস্তা বা তামার পাতে ছবির নকল তোলা হয় ;
- কতো রকম ছাপার কায়দা আছে ;
- ছাপার মেশিন চলে কী করে, কতো ধরনের মেশিন আছে, কার কী চলবার কায়দা, কার কী ভালো-মন্দ ;
- আলগা বড়ো-বড়ো কাগজগুলোকে কেমন করে বইয়ের মাপে ছোটো করে এনে গোছ করতে হয়, গোছগুলোকে সেলাই করতে হয়, কতো রকমের সেলাই আছে, সেলাই করার পর কী করে বোর্ড লাগিয়ে তার ওপর মলাট চড়াতে হয়।
- রঙের রকমারি, কোনটা আসল রঙ, কোনটা মিশেল, কোন রঙ কী দিয়ে তৈরি, কোন রঙের কী স্বভাব, কার পাশে কাকে দিলে মানানসই হয়।

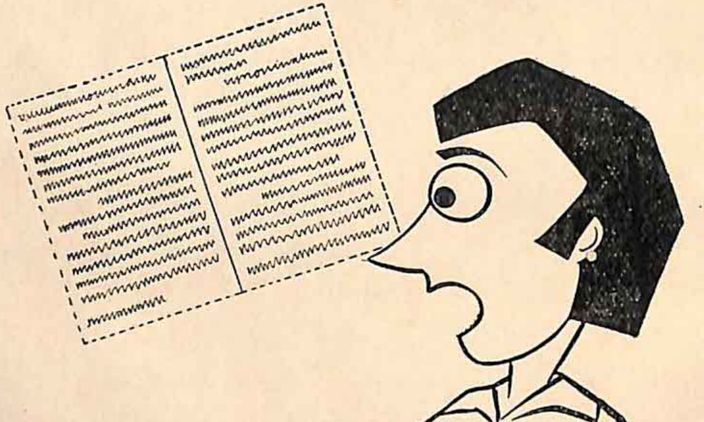
এই সমস্ত খবর যতো ভালো করে যতো গভীর করে জানবে ততো ভালো মুদ্রক হতে পারবে।



শাদায় কালোয়

শাদায় কালোয়

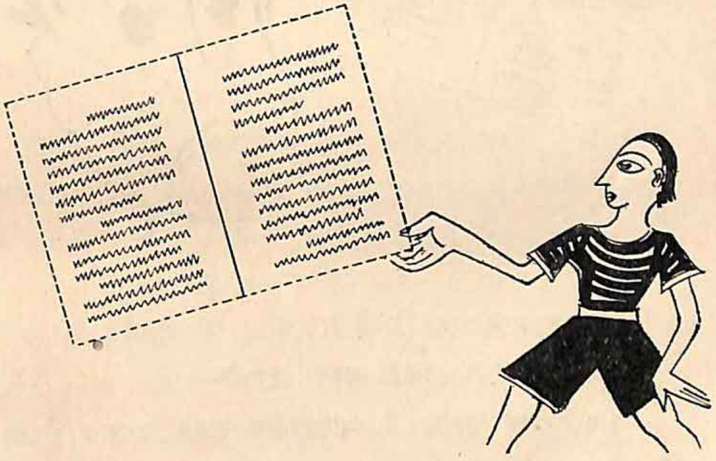
একটা নকশা দেখিয়ে আজ কথাটা পাড়ি। তাতে আমারও বলতে সুবিধে, তোমারও বুঝতে সুবিধে। এই-যে সেই নকশাটা—



চোখে ভালো লাগছে জিনিসটা ? কিছুতেই ভালো লাগতে পারে না। বলো দেখি খুঁতটা কী—দেখি কেমন তোমার মুদ্রকের চোখ !

[বড্‌ডো ঠাসা ! এই রকম ঠাসা-পাতা বেশিক্ষণ পড়া যায় না—মাথা ধরে, চোখ টনটন করে। চারিদিকে একটু খোলা জায়গা চাই।

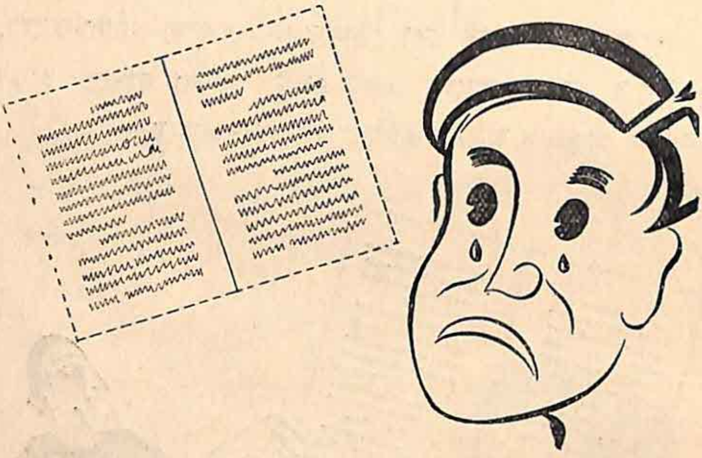
বেশ চোখা চোখ তো তোমার ! বড্‌ডো ঠাসা-কালো, কালোর কোলে-কোলে একটু-একটু আলো ছাড়তে হবে। আচ্ছা, ছাড়লাম আলো, এইবার দেখো নজর করে—



এখন কী বলবে তোমার চোখ ? নিখুঁত ?

[না। বেমানান। আলো অসমান হয়ে পড়েছে—ওপরে আর মাঝের দু পাশে বেশি আলো পড়ে বেখাপ্পা দেখাচ্ছে। এ অচল।

আচ্ছা, এইবার ? কী মনে হয় ?

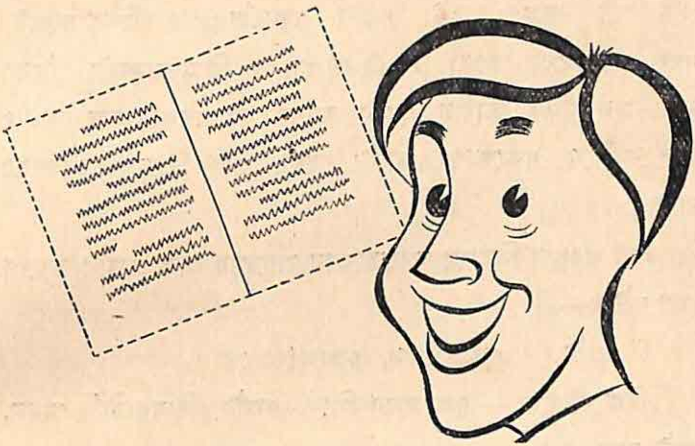


[এটা তো মনে হচ্ছে ঠিকই হয়েছে। কী বলেন ?

কিছুই বলি না, আরেকটা নকশা দেখাই—

[বা-বা, বেশ সুন্দর! আগেরটার চেয়ে অনেক বেশি সুশ্রী, অনেক বেশি সুন্দর। কেমন করে হলো ?

সেইটাই চোখ খুলে দেখা দরকার, গোটা মনটা দিয়ে তলিয়ে বোঝা দরকার।



ছাপা পাতা কালোয়-আলোয় মিলিয়ে একটা মূর্তি, একটা রূপ। কালোকে ফোটাবার জন্যেই আলো। বেহিসেবির মতো যেখানে-সেখানে বা সবখানে আলো ছড়িয়ে দিলে সুন্দর মূর্তি দাঁড়াবে না—অদ্ভুত বা কিম্ভূত কিছু একটা দাঁড়াতে পারে।

কালোয়-আলোয় মিলিয়ে একটা রূপ। যে-যে জায়গায় যতোটুকু যতোটুকু আলো ফেললে কালোর বাহার খোলে, সেই সেই জায়গায় ততোটুকু ততোটুকু আলো ফেলতে হবে!

[সেটা হিসেব করবো কী করে?

পৃথিবীতে রকমারি জিনিস, রকমারি গড়নের জিনিস। এক-এক জিনিস, এক-এক গড়ন।

আমাদের এই জোড়-পাতার একটা নিজস্ব গড়ন আছে। সেটা কী রকম? এটা একটা চতুর্ভুজ। চারদিকে-চারটে-সরল-রেখার-ঘের-দেওয়া একটা জায়গা। কিন্তু গড়নটা চৌকো নয়—জ্যামিতির ভাষায় একটা আয়ত বা রেক্‌ট্যাঙ্গল, অর্থাৎ ডাইনে-বাঁয়ে একজোড়া ছোটো রেখা, ওপর-নিচে একজোড়া বড়ো।

এই ধবধবে নিষ্কলঙ্ক আয়তাকার আলোর বুকে একটা কালো রূপ ফুটবে—

[একটা! একটা কেন, একজোড়া তো!

ঠিক বলেছো,—একজোড়া মিলে একটা, সিমের বীচি যেমন, ছুটো-দলে—

[উদ্ভিদবিদ্যার ভাষায় ছুটো-বীজপত্রে—

বেশ, ছুটো-বীজপত্রে-জোড়-বাঁধা একটা আস্ত বীজ। আমাদের এই পাতাজোড়া ছুটো মিলে একটা আস্ত জিনিস।

এখন আমাদের সামনে সমস্যা দাঁড়াচ্ছে: শাদার ওপরে এই কালো ছবিটা কী মাপের হবে?

[অর্থাৎ, পাশে কতোখানি বাড়বে, আড়ে কতোদূর নামবে।

বাহবা, বাহবা! মুদ্রক হবার মেজাজ বটে তোমার। মাথা তো অনেক খাটালে, এবার একটু গতর খাটাও তো। তাক থেকে 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'-র যে-কোনো একটা খণ্ড নামাও, দেরাজ থেকে সেট-স্কোয়ার-জোড়া, পেনসিল, ডিভাইডার আর মাপ-কাঠিটা বার করো।

'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র যে-কোনো-একটা পাতা মেপে ফেলো তো। কতো হচ্ছে?

[পাশে ৬ ইঞ্চি, আড়ে ৯¼ ইঞ্চি।

তাহলে একটা জোড়-পাতার মাপ কী দাঁড়াবে?

[পাশে ১২ ইঞ্চি, আড়ে ৯¼ ইঞ্চি।

বেশ। এইবার একখানা শাদা বড়ো কাগজের ওপর সেট-স্কোয়ার ফেলে জোড়-পাতার মাপটা ছকে ফেলো। কিন্তু অবিকল ঐ ছাপা পাতার মাপ নিও না, একটু বাড়িয়ে নিয়ে আঁকো : পাশে ১২½ ইঞ্চি, আড়ে ১০ ইঞ্চি।

[কেন, বাড়াতে বলছেন কেন?

এইজন্যে যে, ছাপা পাতাটা আছাপা শাদা পাতার চেয়ে মাপে ছোটো। ছাপার পর দপ্তরি কেটে ছোটো করে দিয়েছে— ধারগুলো সমান করবার জন্যে।

[বুঝলাম। এইবার ছকে ফেলি পাতাটা।

হয়েছে? আচ্ছা, এইবার আড়ের দিকে ঠিক মাঝখান দিয়ে একটা দাগ টেনে দাও—জোড়টা তৈরি হলো।

এর পর থেকে মাঝে মাঝে ইঞ্চির মাপে কথা না বলে আমি অন্য আরেকটা মাপে কথা বলবো। আমি বলবো, পাতাটা

পাশে, ৭৫ এম আড়ে, ৬০ এম

এই 'এম' মাপটা ছাপাখানার মাপ।

ইঞ্চির মাপ থেকে 'এম' মাপে আনার হিসেবটা কী বলো তো একটু মাথা খাটিয়ে—

[১ ইঞ্চিতে ৬ এম।

বেশ। এখন কাজটা কী?

[কতোটা জায়গায় ছাপা হবে।

হ্যাঁ, কাজ হলো: কালোর সঙ্গে শাদার অনুপাত ঠিক করা—কতোটা কালোয় কতোটা আলো। আমার একটা সূত্র জানা আছে:

তিনে দুই

'তিনে-দুই' সূত্রটার ভাষ্য হলো: সমস্ত জমিটাকে তিন ভাগে ভাগ করে তার দু ভাগে কালো দাও, এক ভাগে আলো। সেই হিসেবে—

[দাঁড়ান, হিসেবটা আমিই কষি:

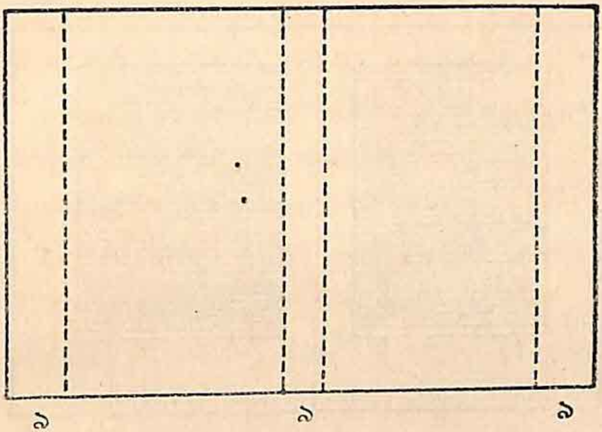
পাশের ৭৫ এম=কালো ৫০ এম+শাদা ২৫ এম

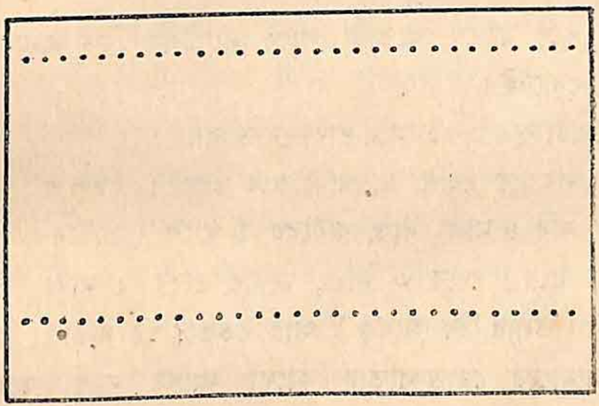
আড়ের ৬০ এম=কালো ৪০ এম+শাদা ২০ এম

হিসেবে মিল আছে। কিন্তু আমি সামান্য একটু গরমিল করবো: পাশে শাদা অংশে ২৫ এম না দিয়ে ২৭ এম দেবো—ভাঙবার সময় ভগ্নাংশ এড়াবার জন্যে।

পাশের দিকে ২৭ এম শাদাকে তিন অংশে ভেঙে নাও: ৯+৯+৯। বাঁয়ে, মাঝে আর ডাইনে ৯ এম করে জায়গা দিয়ে রাখা গেলো।

আড়ের দিকের ২০ এম শাদাকে কমবেশি করে দুই অংশে ভেঙে নাও: মাথায় ৬ এম, তলায় ১৪ এম।

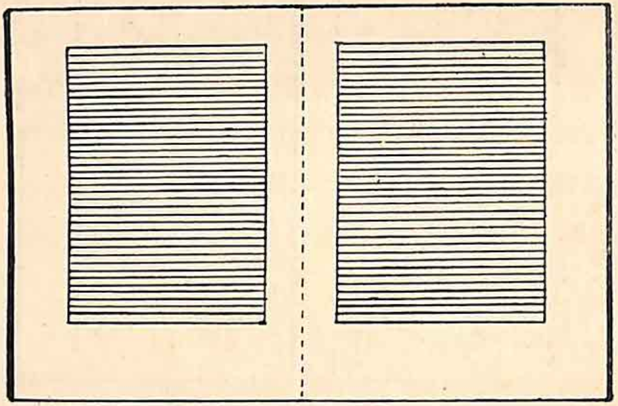




৬+১৪

[কমবেশি কেন ? সমান-সমান হতে দোষ কী ?

দেখতে ভালো দেখায় না। মাথায় বেশি তলায় কম শাদা থাকলে মনে হয় পাতাটা যেন ঝুলে পড়তে চাইছে। সমান-



সমান হলে চোখে অতোটা লাগে না ঠিকই, কিন্তু মানানসই হয় না মোটেই।

মোটা সূত্র একটা মনে রাখা যেতে পারে :

> সবচেয়ে বেশি জায়গা থাকবে তলায়। তলায় যদি ৪ মাত্রা দাও, বাইরের দু পাশে (ডাইনে-বাঁয়ে) দেবে ৩ মাত্রা, মাথায় দেবে ২ মাত্রা (তলার ঠিক অর্ধেক), আর ভেতরে ১½ মাত্রা।

আমাদের জোড়-পাতার কালো অংশের মাপ তাহলে দাঁড়ালো : ৪৮ এম × ৪০ এম। দু ভাগে ভাঙলে : ২৪ এম × ৪০ এম—এটা একটা পাতার মাপ।

এইটা হলো আদর্শ। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে দেখা যাবে, সব সময়ে এ আদর্শের নির্দেশ মানতে পারা যায় না।

একজন প্রকাশক একবার মনস্থ করলেন, ছোটোদের এক বার্ষিকী প্রকাশ করবেন। তাঁর মাথায় একটা হিসেব ছিলো : ছু,শো পাতার বই, দাম আড়াই টাকা। আমাকে বললেন, বইটা ছাপার একটা পরিকল্পনা করে দিন।

আমি আমার আদর্শ সূত্র ধরে, দরাজ হাতে শাদা জায়গা ছেড়ে দিয়ে পরিকল্পনা করতে গিয়ে দেখলাম, ছু শো পাতায় কুলোয় না, তিন শো পাতা হলে ঠিক হয়।

এই কথা মুখ থেকে বেরিয়েছে কি না বেরিয়েছে,—প্রকাশক ভদ্রলোক তেলেবেগুনে চটে উঠলেন : 'কোন দেশে আছেন মশাই! তিন শো পাতা হলে দাম ফেলতে হয় সাড়ে তিন টাকা। এই বাজারে অতো দামে কেউ ছোটোদের জন্যে বই কেনে! খালি আর্ট করলেই হয় না, বাজারটাও দেখতে হয়!'

তখন আমিও খুব চটে উঠেছিলাম। কিন্তু এখন বুঝি, খুব সত্যি কথা বলেছিলেন প্রকাশক-ভদ্রলোক। বাজারের সঙ্গে আপোস করে চলতে হবে। তাতে মন খারাপ করে লাভ নেই। লোকে কিনতে না পারলে বই ছাপানো বৃথা। মানুষের আর্থিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারাই তো বাহাদুরি!

আমাদের আদর্শ মাপ ছিলো :

২৪ এম × ৪০ এম

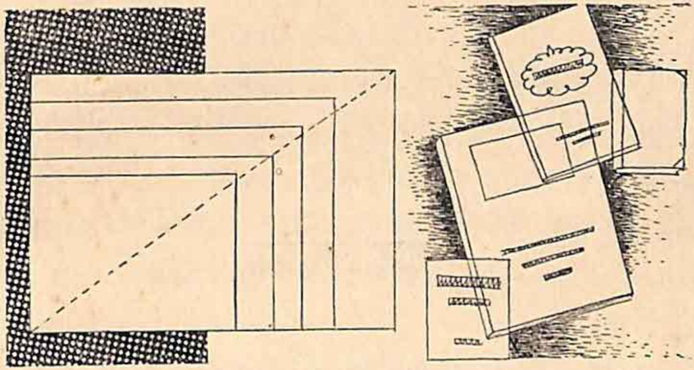
'রবীন্দ্র-রচনাবলী' খুলে দেখবে :

২৬ এম × ৪২ এম

প্রকাশকের প্রয়োজনে করতে হতে পারে :

২৮ এম × ৪৮ এম

বাজারের তাগিদে আলো কমাতে হয়, কালো বাড়াতে হয়। কিন্তু তা করতে গিয়েও তলা-পাশ-মাথার মার্জিনের যে-অনুপাতটা আছে সেটাকে লঙ্ঘন করা চলবে না—কিছুতেই না, কোনোক্রমেই না।



কতো বিচিত্র

কতো বিচিত্র

[বই তো কতো মাপেরই হয় দেখি। কাগজও তাহলে নিশ্চয়ই হরেক মাপের তৈরি হয় ?

কথাটা পেড়েছো ভালো।

এতোক্ষণ ধরে শাদা-কালোর যে হিসেব-নিকেশ হলো, তা বিশেষ-এক মাপের কাগজ ধরে। সেই মাপের নাম হলো রয়্যাল। কেন জানি না, এদেশে এই মাপটার চলন বড়ো কম। অথচ, এই রয়্যাল কাগজকে তিন ভাঁজ করলে যে-মাপ দাঁড়ায় সেটা তিনে-দুই সূত্রের খুব কাছাকাছি—আড়ে ১০ ইঞ্চি, পাশে ৬¼ ইঞ্চি। আমাদের দেশে খুব বেশি চলন অন্য দুটো মাপের : ক্রাউন আর ডিমাই। ক্রাউনকে তিন ভাঁজ করলেও সুন্দর মাপ বেরোয় : ৭½ ইঞ্চি × ৫ ইঞ্চি। এ-মাপটা তিনে-দুই সূত্রের সঙ্গে অবিকল মিলে যায়। ফুলস্কেপ এদেশে মন্দ চলে না—'মৌচাক' 'শিশুসাথী' প্রভৃতি ছোটোদের পত্রিকাগুলো ফুলস্কেপ সাইজের।

সুতোকলে কাপড়ের লম্বা-লম্বা থান তৈরি হয়। পরে তাকে দরকারমতো ছোটো ছোটো মাপে কেটে নেওয়া হয়। কাগজের কলেও তেমনি 'কাগজের থান' তৈরি হয়। সেই একটানা লম্বা-লম্বা কাগজকেই রীলে জড়িয়ে খবরের কাগজের আপিসে পাঠানো হয়। সেখানে খবর ছাপা হয় তিন-চার-তলা-সমান উঁচু দৈত্যাকার যে রোটারি মেশিনে, সেখানে অতো লম্বা-লম্বা কাগজই দরকার। কিন্তু সাধারণ যে-সব ছাপাখানায় বই-টই ছাপা হয়, সেখানে অন্য ধরনের ছোটো মেশিন। সে-মেশিনে ছাপতে গেলে কাগজকে মাপমতো কেটে নিতে হয়।

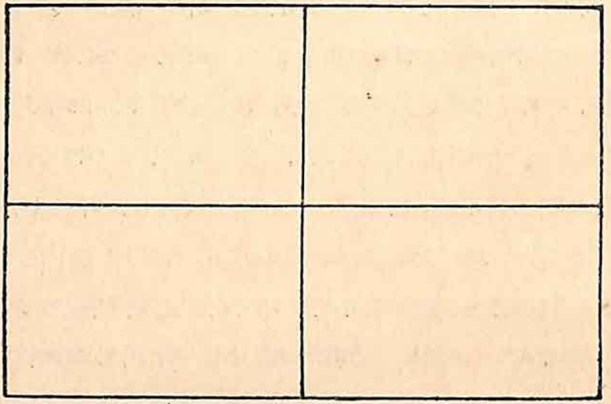
ফুলস্কেপ, ক্রাউন, ডিমাই, রয়্যাল—আলাদা-আলাদা নাম, আলাদা-আলাদা মাপ :

ফুলস্কেপ = ১৭ × ১৩½ ইঞ্চি
ক্রাউন = ২০ × ১৫ "
ডিমাই = ২২½ × ১৭½ "
রয়্যাল = ২৫ × ২০ "

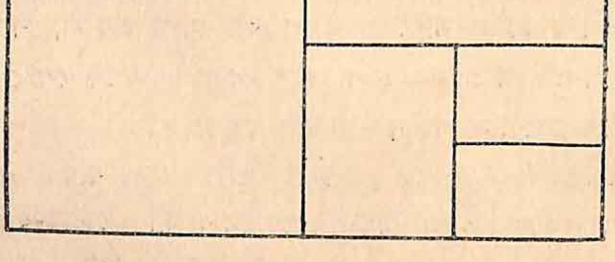
যে-মাপগুলো দিচ্ছি সেগুলো পুরো, আভাঁজা কাগজের মাপ। আভাঁজা পুরো কাগজকে বলে ব্রডশীট। ব্রডশীটের আভাঁজা ঢাউস সাইজের মাপে বই ছাপা হয় না, পোস্টার, দেয়াল-পত্রিকা এইসব ছাপা হতে পারে। ব্রডশীটকে ভেঁজে-ভেঁজে ছোটো মাপের পাতায় দাঁড় করাতে হয়।

ব্রডশীটকে দু-তিন কায়দায় ভাঁজ করা যায়। একটা কায়দা হলো, বড়ো দিকটা ধরে আধাআধি ভেঁজে যাওয়া।

এইটাই চলতি কায়দা। আরেক কায়দা হলো, ছোটো দিকটা ধরে আধাআধি ভেঁজে যাওয়া।



বড়ো দিক ধরে আধাআধি ভাঁজ



এই একটা ডবল ক্রাউন কাগজ। নিজের হাতে ভেঁজে-ভেঁজে মেপে-মেপে যাও। পুরো ব্রডশীটের মাপটা কী?

[লম্বায় ৩০ ইঞ্চি, আড়ে ২০ ইঞ্চি।

বেশ। বড়ো দিকটাকে আধাআধি ভেঁজে ঘুরিয়ে নাও। এখন, একভাঁজ দেবার পর, আগের বড়ো দিকটা হয়ে গেছে ছোটো দিক। কী মাপ দাঁড়িয়েছে?

[লম্বায় ২০ ইঞ্চি, আড়ে ১৫ ইঞ্চি।

এবার বড়ো দিকটাকে আধাআধি ভেঁজে ঘুরিয়ে নাও। কী মাপ দাঁড়ালো?

[লম্বায় ১৫ ইঞ্চি, আড়ে ১০ ইঞ্চি।

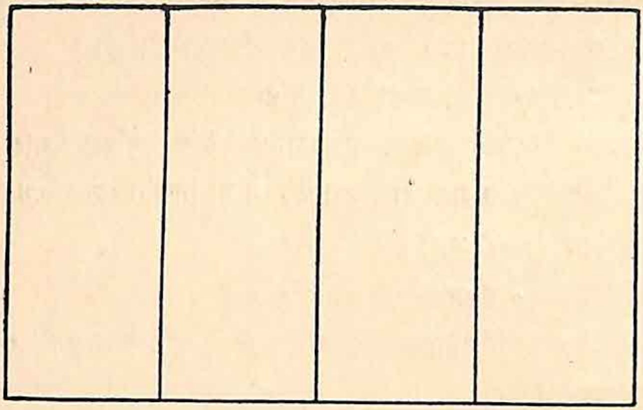
এবার বড়ো দিকটাকে আধাআধি ভেঁজে ঘুরিয়ে নাও। মাপ?

[লম্বায় ১০ ইঞ্চি, চওড়ায় ৭$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

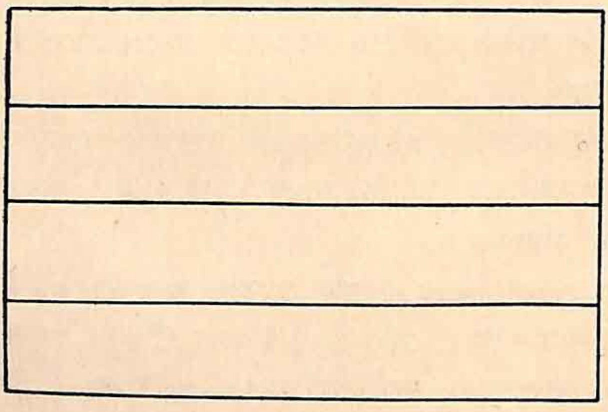
এইভাবে আধাআধি এক-ভাঁজ, দু-ভাঁজ, তিন-ভাঁজ, চার-ভাঁজ দিতে-দিতে ব্রডশীটকে ইচ্ছেমতো ছোটো মাপে নিয়ে আসা যায়।

[সব সময়ে কি এই ভেঁজে-ভেঁজে মাপ বার করতে হবে নাকি? সব সময়ে সব মাপের কাগজ হাতের কাছে যে থাকবেই, এ কথা কি বলা যায়?

সে দুর্ভাবনা থাকে না যদি প্রত্যেক কাগজের ব্রডশীটের মাপটা মুখস্থ থাকে। সেটা মুখস্থ থাকলে, এইভাবে অঙ্ক কসে ভাঁজের মাপগুলো চট করে পেয়ে যাবে। ব্রডশীটের—



আধাআধি দু ভাঁজ : বড়ো-ছোটো দু দিক ধরে



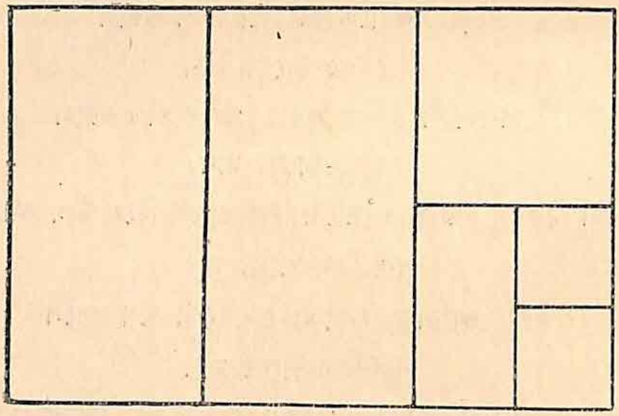
বড়ো দিকটাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে
পাই এক-ভাঁজের মাপ
বড়ো-ছোটো দু দিককেই দুই দিয়ে ভাগ করলে
পাই দু-ভাঁজের মাপ
বড়ো দিককে চার আর ছোটো দিককে দুই দিয়ে ভাগ করলে
পাই তিন-ভাঁজের মাপ
বড়ো-ছোটো দু দিককেই চার দিয়ে ভাগ করলে
পাই চার-ভাঁজের মাপ

এইভাবে চার্ট করে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখতে পারো ঃ

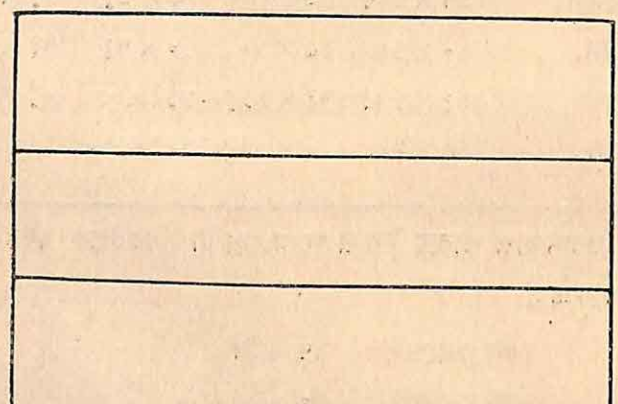
কাগজের নাম	আভাঁজা	এক-ভাঁজ	দু-ভাঁজ	তিন-ভাঁজ
ফুলস্কেপ	১৭ × ১৩ ১/২	১৩ ১/২ × ৮ ১/২	৮ ১/২ × ৬ ৩/৪	৬ ৩/৪ × ৪ ১/৪
ক্রাউন	২০ × ১৫	১৫ × ১০	১০ × ৭ ১/২	৭ ১/২ × ৫
ডিমাই	২২ ১/২ × ১৭ ১/২	১৭ ১/২ × ১১ ১/৪	১১ ১/৩ × ৮ ৩/৪	৮ ৩/৪ × ৫ ৫/৮
রয়্যাল	২৫ × ২০	১০ × ১২ ১/২	১২ ১/২ × ১০	১০ × ৬ ১/৪

ডবল মাপ পাবার উপায় হলো ছোটো দিকটাকে দুই দিয়ে গুণ করা:

ডবল ফুলস্কেপ : ২৭ × ১৭
ডবল ক্রাউন : ৩০ × ২০
ডবল ডিমাই : ৩৫ × ২২ ১/২
ডবল রয়্যাল : ৪০ × ২৫



তিন ভাগের ভাঁজ : বড়ো-ছোটো দু দিক ধরে



[আর কোনোভাবে কাগজ ভাজা যায় না?

বড়ো দিকটাকে সমান তিন ভাঁজে ভেঁজে, সেই তিন অংশ থেকে ছয়, বারো, চব্বিশ, আটচল্লিশ অংশ বার করতে পারো।

এই তিনের ভাঁজের নানান অংশের মাপ পাবার সূত্র হলো, প্রথমে বড়ো দিকটাকে তিন ভাঁজ দিয়ে, তারপর থেকে বড়ো দিকটাকে দুই দিয়ে ভাগ করে যাওয়া। যেমন,

ক্রাউন ব্রডশীট ঃ ২০×১৫। তিন অংশ : ১৫×৬$\frac{৫}{৮}$। ছ অংশ : ৭$\frac{১}{২}$×৬$\frac{৫}{৮}$। বারো অংশ : ৬$\frac{৫}{৮}$×৩$\frac{৩}{৪}$। চব্বিশ অংশ : ৩$\frac{৩}{৪}$×৩$\frac{১}{৪}$

বড়ো দিক ধরে তিন ভাঁজ দিয়ে যেমন এক ধরনের ভাগ হলো, ছোটো দিক ধরে তিন ভাঁজ দিয়ে তেমনি অন্য এক ধরনের ভাগ পাওয়া যায়।

আরো তিনটে মাপ মনে রাখা দরকার। এগুলো প্রচলিত মাপেরই অল্প-একটু রকমফের। যেমন,

ডবল ক্রাউন : ৩০ ×২০ ॥ ইম্পিরিয়্যাল : ৩০ ×২২

ডিমাই ঃ ২২$\frac{১}{২}$×১৭^{১} ॥ মিডিয়াম : ২৩ ×১৮

রয়্যাল : ২৫ ×২০ ॥ সুপার রয়্যাল : ২৭$\frac{১}{২}$×২০$\frac{১}{২}$

[মাপজোপ হিসেবপত্তর অনেক হলো। টুকে রাখলাম। মুখস্থ করে ঠিক করে নেবো। এখন বলুন কাগজ তৈরি হয় কী করে আর কী দিয়ে।

কী করে তৈরি হয় সে মজার গল্প আপাতত খুব ছোটো করে জেনে রাখলেই চলবে। কী দিয়ে তৈরি হয় মোটামুটি বলবো। কতো জাতের কাগজ আছে, কোন ছাপায় কোনটার চলন—সে-সব কথাও জেনে রাখতে হবে।

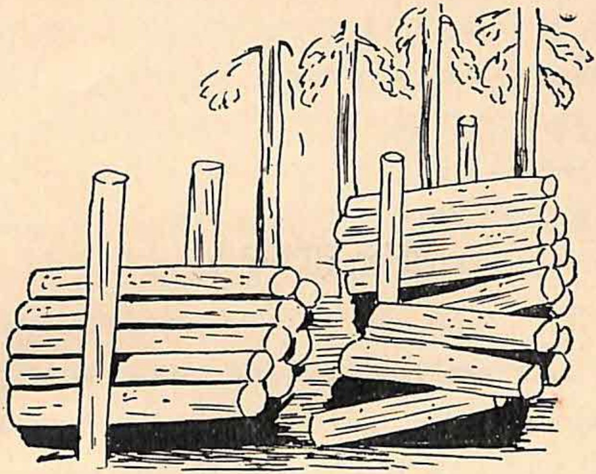
॥ কাগজের গুনতি ॥

২৫ তা = ১ দিস্তে

২০ দিস্তে = ১ রিম

২০ রিম = ১ বেল

॥ মুখস্থ করে রেখো ॥



কোন বৃক্ষের ?

কোন বৃক্ষের ?

কাগজ তৈরি হতে পারে কোন কোন জিনিস দিয়ে ? যে-যে জিনিসের আঁশ বা fibre আছে, সেদ্ধ করে নরম করে ফেললে যাদের যেমন-ইচ্ছে পাতলা-মোটা ছোটো-বড়ো আকার দেওয়া যায়, সেই সেই জিনিস দিয়ে কাগজ তৈরি হয়।

যেমন, সুতি কাপড়, শনের কাপড়, রেশমের টুকরো, তুলো, বাঁশ, খড়, ঘাস, কাঠ।

ছাপার কাগজ সম্বন্ধে তিনটি শব্দ মনে রাখা চাই : [১] ফাইবার (fibre) [২] লোডিং (loading), [৩] সাইজিং (sizing)। ছাপার কাগজের যতো জাতিভেদ দেখো, সে এই তিনটি জিনিসের তারতম্যের ওপর।

কাগজের দামের তফাত হয় প্রধানত ফাইবার-এর তফাতের ওপর। যে-কাগজ শুধুই সুতি কাপড়ের টুকরো দিয়ে তৈরি, সে-কাগজ দেখতে হয় ধবধবে শাদা, মোলায়েম নরম, হাতে

ধরতে আরাম, খুব টেঁকসই ; সেরা কালো কালি দিয়ে যদি সেই কাগজে বই ছাপো, ছাপা একেবারে মুক্তোর মতো ঝকঝক করবে। কিন্তু সে-কাগজের দামটিও দিতে হবে মুক্তোর দরে।

অতো দামি কাগজে তো সব বই ছাপা সম্ভবও নয়, তার দরকারও নেই। সাধারণ বই ছাপবার জন্যে একটু কম দামের কাগজ চাই। পুরোটা সুতি কাপড়ের টুকরো না দিয়ে তার সঙ্গে যদি কাঠের আঁশ মিশেল দেওয়া যায়, তাহলেই দাম অনেকটা কমানো যায়। সেই মিশেল কাগজও ভালো কাগজ— নরম, অস্বচ্ছ, ছাপা বেশ খোলে! কাঠের আঁশ না দিয়ে কয়েক জাতের ঘাসও মিশেল দেওয়া হয় কাপড়ের টুকরোর সঙ্গে। যেমন,—এসপার্টো ঘাস, স্পেনে আর উত্তর আফ্রিকায় জন্মায়। এই এসপার্টো-মেশানো কাগজে ছাপা বেশ চেকনাই দেয়, প্রচুর ছবিওয়ালা বই বা পত্রিকা খুব সুন্দর ছাপা হয়।

[আচ্ছা, যে-কোনো কাঠের আঁশেই কাগজ তৈরি হয় ?

প্রধানত ব্যবহার করা হয় স্প্রুস্, পপলার, পাইন, অ্যাসপেন গাছের কাঠ। স্প্রুস্ কাঠের কাগজ খুব মজবুত হয়, অন্য গাছগুলোর কাঠে তৈরি কাগজ ওজনে বেশ ভারি হয়, বই বেশ ভারি, মোটাসোটা হয়।

শুধুই কাঠ দিয়ে যে কাগজ তৈরি হয় তার দাম খুব সস্তা। দামে যেমন খুব সস্তা, টেঁকেও তেমনি কম, কিছু দিন পরেই তার রঙ মরে যায়। ঐ জাতের কাগজ দিয়ে খবরের কাগজ ছাপা হয়।

এইভাবে ফাইবার-এর রকমফেরে কাগজের জাতের রকমফের হয়, দামের কমবেশি হয়।

[লোডিং সাইজিং কী-সব বললেন, তার মানে কী ?

কাগজ তৈরির ব্যাপারটা খুব ছোট্ট করে বলা যাক।

মনে করো, তোমার কাঁচামাল হলো এসপার্টো ঘাস। স্পেন থেকে বস্তা-বস্তা ঘাস তোমার গুদামে জমা হচ্ছে। এর মধ্যে ধুলোবালি কাঁকর-শেকড় ইত্যাদি বাজে জিনিস মিশে আছে। ডাস্টার বলে একটা মেশিন আছে। সেই মেশিনে ঢেলে দিয়ে ধুলো-বালি কাঁকর-শেকড় পরিষ্কার করে নেওয়া হলো। তারপর ঘাসগুলোকে কুচিকুচি করে কেটে ডাইজেস্টার বলে একটা মেশিনে ফেলে কস্টিক সোডা মিশিয়ে বেশ কয়েক ঘণ্টা ফোটানো হয়। ঘাসগুলো নরম হয়ে থকথকে মণ্ডের মতো দেখতে হয়েছে। এইবার ঐ মণ্ডকে ডাইজেস্টার থেকে বার করে নিয়ে বেশ ভালো করে জল দিয়ে ধুতে হয়। তারপর তার মধ্যে দরকারমতো কাঠের মণ্ড মেশাতে হবে। মিশিয়ে ঐ মিশেলকে 'বীটিং এনজিন'-এ ঢালতে হবে। 'বীটিং এনজিন' হলো প্রকাণ্ড এক কড়া, কড়ায় একটা চাকা আছে, চাকার গায়ে অনেকগুলো ইস্পাতের ছুরি লাগানো আছে। চাকাটা বনবন করে ঘোরে আর চাকার ছুরিগুলো ঐ মিশেল মণ্ডের আঁশ-গুলোকে কেটে-কেটে ছোটো করে দেয়, পেঁজাই করে দেয়।

এইবার লোডিং। ঐ কাটা-পেঁজা মণ্ডের মধ্যে চীনেমাটি (china clay) ইত্যাদি জিনিস মেশানোর নামই হলো লোডিং।

[লোডিং করা হয় কেন ?

আঁশগুলো যতোই গায়ে-গায়ে লাগালাগি করে থাকুক না কেন, একটু-আধটু ফাঁক থেকেই যায়। সেই সূক্ষ্ম ফাঁকগুলোকে ভরাট করে দেবার জন্যেই লোডিং। লোডিং করলে কাগজের বুননটা বেশ নিরেট ঠাসা হয়, তার ফলে সব জায়গায় কালিটা সমান ঘন হয়ে লাগে বলে ছাপার সুবিধে হয়, আর কাগজটা অস্বচ্ছ হয়—এপিঠের ছাপা ওপিঠে ফুটে ওঠে না।

[চীনেমাটি ইত্যাদি অন্য জিনিস কতোটা দিতে হয় ?

এক-এক জাতের কাগজে এক-এক রকম লোডিং। লোডিং কাগজের মোট ওজনের ৫% থেকে ৩০% পর্যন্ত হয়। একটু পরেই ইমিটেশন আর্ট কাগজের নাম করবো। সে-কাগজে সবচেয়ে বেশি লোডিং দেওয়া হয়, কারণ সে-কাগজে হাফটোন ছবি ছাপা হয় আর খুব সমান মসৃণ কাগজ না হলে হাফটোন ছবির ছাপা ভালো হয় না।

[হাফটোন ছবি কী ?

এখন শুধু নামটা শুনে রাখো, আর কয়েকদিন পরে ভালো করে বুঝবে। এখন শোনো, কাগজের সাইজিং কাকে বলে।

লোডিং হলে, সাইজিং। সাইজিং মানে ঐ মণ্ডের মধ্যে ফিটকিরি বা ঐ-জাতীয় রাসায়নিক মিশিয়ে দেওয়া।

[তার উদ্দেশ্য ?

আমি একটা প্রশ্ন করি : ব্লটিং কাগজ করে কী ?

[কালি শুষে নেয়।

আর ?

[ব্লটিং কাগজে কালিটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এপিঠে কালি লাগলে ওপিঠও কালিমাখা হয়ে যায়।

ছাপার কাগজ বা লেখার কাগজ যদি ব্লটিং কাগজের মতো ব্যবহার করে ?

[তাহলে লেখাও যায় না, ছাপাও যায় না।

সেই জন্যেই সাইজিং। ব্লটিং কাগজ সাইজ করা হয় না, তাই কালি শুষে নেয়। ছাপার আর লেখার কাগজ সাইজ না করলে অচল।

লেখার কাগজকে কড়া করে সাইজ করতে হয়, কারণ লেখার কালি পাতলা। ছাপার কাগজকে নরম করে সাইজ করলেই কাজ চলে।

এইবার ঐ মণ্ড আসল মেশিনে এলো। মেশিনের প্রথম অংশ হলো একটা ছাঁকুনি। মণ্ডের মধ্যে ছিটছাট যা তখনো থেকে যায় ঐ ছাঁকুনি তা বার করে দেয়। ঐ ছাঁকুনি থেকে মণ্ড পাম্প বেয়ে জালতিতে গেলো। ফসফর-ব্রোনজের সরু সরু তার দিয়ে ঐ সূক্ষ্ম জালতি তৈরি, এক-এক ইঞ্চিতে প্রায় ৭২টা চৌখুপি—এতো সূক্ষ্ম। জালতি ঘুরে ঘুরে চলেছে আর ঐ জালতির ওপর দিয়ে অবিরাম স্রোত বয়ে যাচ্ছে—তরল মণ্ডের স্রোত। মণ্ডের ঐ স্রোতকে ইচ্ছেমতো কমিয়ে-বাড়িয়ে কাগজের ওজন আর ঘনতা কমানো-বাড়ানো যায়। স্রোত বয়ে যাচ্ছে, জালতির ফাঁক দিয়ে জল ঝরে পড়ে যাচ্ছে, আঁশগুলো জালতির ওপর পাশাপাশি জড়ো হচ্ছে। আঁশগুলো

যাতে একপেশে হয়ে জড়ো না হয় সেই জন্যে জালতি অনবরত পাশাপাশি নড়ে-নড়ে আঁশগুলোকে সমান করে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

মণ্ডের জল তো অনেকখানিই ঝরে পড়ে গেছে। এরপর জোটবাঁধা আঁশগুলো যখন ভ্যাকুঅম বাক্সের ভেতর দিয়ে এগোতে থাকে তখনও অনেকখানি জল বেরিয়ে যায়। এরপর কাঁচা কাগজ একটা রোলের মধ্যে ঢুকে যায়। রোলার ঘোরে, তার সঙ্গে সঙ্গে বনাতের থানে ঢাকা হয়ে কাঁচা কাগজের থানও ঘুরতে থাকে। সেই বনাতের ওপর কোনো লেখা বা চিহ্ন যদি আঁকা থাকে, সেই লেখা বা চিহ্ন কাগজের ওপরও পড়ে যায়। কাঁচা কাগজ এখনও যথেষ্ট ভিজে আছে। স্টীমে-গরম পরপর কয়েকটা সিলিন্ডারের ভেতর দিয়ে এইবার কাগজের থানকে চালিয়ে দেওয়া হয়, শেষ সিলিন্ডারটা পেরিয়ে আসার সঙ্গে কাগজ শুকিয়ে খটখটে হয়ে যায়। এরপর ক্যালেন্ডার মেশিনে চাপ দিয়ে কাগজের জমিকে সমান আর মসৃণ আর ঝকঝকে করে দেওয়া হয়।

কাগজ তৈরির ব্যাপারটা খুব সংক্ষেপে ওপর-ওপর আলোচনা করলাম। এইবার নানান শ্রেণীর কাগজের নামভেদে গুণভেদের কথা বলি।

অ্যান্টিক॥ বই ছাপার কাগজ। খসখসে জমি। পুরু কাগজ, বই মোটা দেখতে হয়। এই কাগজে হাফটোন ছবি ছাপা যায় না।

অ্যান্টিক দু রকম : অ্যান্টিক উওভ, অ্যান্টিক লেইড। যে কাগজে লম্বা-লম্বা সমান্তরাল দাগ থাকে তাকে বলে লেইড, দাগ না থাকলে উওভ।

এম. এফ. প্রিন্টিং॥ অ্যান্টিক উওভ কাগজ, কিন্তু অ্যান্টিকের মতো পুরু নয়, রোলার চালিয়ে ঘনতাকে কমিয়ে আনা হয়। রোলারের চাপে জমিটাও অ্যান্টিক উওভের চেয়ে মসৃণ হয়।

আইভরি ফিনিশ ও সুপার ক্যালেন্ডার্ড প্রিন্টিং॥ এম. এফ. প্রিন্টিংকে আরো কয়েকবার পালিশের রোলারের ভেতর দিয়ে ঘুরিয়ে আনলে যে চকচকে জমির কাগজ বেরিয়ে আসে তাকে বলে আইভরি ফিনিশ কাগজ।

এম. এফ. প্রিন্টিং-এর মণ্ডের সঙ্গে অল্প একটু চীনেমাটি মিশিয়ে, তৈরি কাগজকে ক্রমান্বয়ে একবার ইস্পাতের আর একবার কাগজের রোলারের ভেতর দিয়ে কয়েক বার ঘুরিয়ে যে উজ্জ্বল চকচকে মসৃণ জমির কাগজ পাওয়া যায় তারই নাম সুপার ক্যালেন্ডার্ড প্রিন্টিং। যে-বইতে লেখার সঙ্গে হাফটোন ছবি ছাপতে হবে সে-বই এই কাগজে বেশ খোলে।

আর্ট পেপার॥ ভালো হাফটোন ছবির সেরা ছাপার উপযুক্ত কাগজ। যথেষ্ট পরিমাণ চীনেমাটি আর গঁদ মিশিয়ে

কাগজের অমন সুন্দর এনামেলের মতো ঝকঝকে, চমক-দেওয়া জমি তৈরি করা হয়। খুব দামি কাগজ।

ইমিটেশন আর্ট ॥ গুণে আর্ট পেপার-এর কাছাকাছি যায়। বেশ বেশি পরিমাণে (প্রায় ৩০%) চীনেমাটি মেশানো হয়।

কভারের কাগজ ॥ তৈরি করার প্রণালী অ্যান্‌টিক কাগজের মতোই। মণ্ডে রকমারি রঙ মিশিয়ে নানান রঙের কভার-কাগজ তৈরি করা হয়। নকশা-কাটা রোলার চালিয়ে কাগজের ওপর নানান নকশা তোলা হয়।

এ ছাড়াও আরো অনেক জাতের কাগজ আছে। কিন্তু প্রথমে এই কটা জাতের সঙ্গে পরিচয়টাই ভালো করে হোক।

কেনা-বেচা

মনে করো, আমি দোকানদার, তুমি খদ্দের।

[মশাই, অ্যান্‌টিক উওভ কাগজ আছে ?

আছে ; কী সাইজ ?

[ডবল ক্রাউন ; রিম দশেক দিতে পারবেন ?

১০ কেন, ১০০ রিম চাইলেও পাবেন। কিন্তু দাদা—আমাদের নগদ কারবার।

[আমিও ধারে কারবার করি না। ক্যাশমেমো কাটুন।

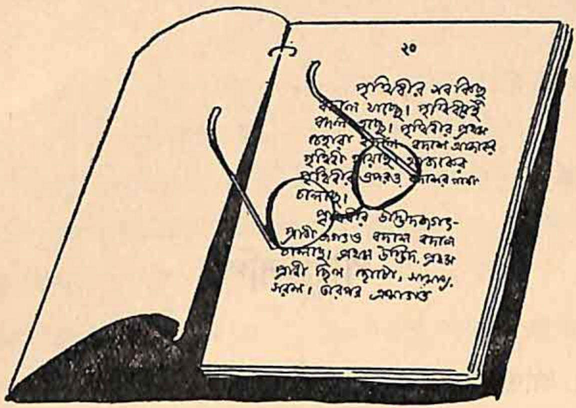
মশাই, ওয়েট কতো ?

[অ্যাঁ ?

কতো ওজনের কাগজ দেবো ?

[যা ভালো হয় দিন।

হেরে গেলে তো ! কাগজের রিমপিছু একটা ওজন থাকে। ওজনটা করা হয় পাউণ্ড-এর মাপে। কাগজ কিনতে গেলে ওজনটা বলতে হবে—২৮ পাউণ্ড কি ৩২ পাউণ্ড কি ৩৬ পাউণ্ড। কাগজের দামও ধরা হয় পাউণ্ড হিসেবে। পাউণ্ড-পিছু দাম যদি হয় ১২ আনা, ২৮ পাউণ্ড কাগজের দাম হবে ২১ টাকা, ৩২ পাউণ্ড কাগজের দাম ২৪ টাকা।



পাণ্ডুলিপি

পাণ্ডুলিপি

বাঙলা অভিধানখানা একবার নামাতে হবে যে। দেখো তো, পাণ্ডুলিপি কথাটার মানে কী লেখে ?

['খশড়া, মুশাবিদা, মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত লেখা'।

এই শেষের মানেটাই মনে রাখতে বলছি—'মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত লেখা'। ছাপাখানার কারিগরেরা অবশ্য আরো সোজা একটা শব্দ ব্যবহার করেন—'কপি'। কিন্তু পাণ্ডুলিপ-অর্থে কপি শব্দ ব্যবহার করায় আমার প্রচণ্ড আপত্তি।

[কেন ?

একটু পরেই শুনো। পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে প্রথমেই ঠিক করতে হয়, কোন সাইজের কাগজে বই ছাপা হবে। পরপর সাইজগুলো মনে আসে—ডবল ক্রাউন, ইম্পিরিয়্যাল, ডবল ডিমাই, রয়্যাল, সুপার রয়্যাল, ফুলস্কেপ।

[কোন সাইজটা নেবো ? যেটা খুশি ?

না, তা নয়। লেখকের কী ইচ্ছে জানতে হয়। প্রকাশক

কোন সাইজটাকে স্থবিধে মনে করেন জেনে নিতে হয়। বইয়ের পাড়ায় কতোগুলো রেওয়াজ আছে, সেগুলোকে প্রায়ই মান্য করে চলতে হয়। যেমন, কবিতার বই ফুলস্কেপে ছাপা হয় না, বেশির ভাগই হয় আট-পেজি ডিমাই-এ। গল্প-উপন্যাসে রয়্যালের ব্যবহার হয়ই না বলা চলে, বেশির ভাগই ১৬-পেজি ডবল ক্রাউনে বা ইম্পিরিয়্যালে। এ-সব রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেছে।

তবু রেওয়াজও পালটায়। সাহস করে পালটানো যায়। আট-পেজি ডিমাই-এ পাঁচ-ছ শো পাতার উপন্যাস ছাপলে দেখতে-শুনতে ভালোই হয়। দশ বছর আগে কিন্তু এ-কথা কেউ বিশেষ ভাবতো না। এখন অনেকেই ভাবছে, করছে। কবিতার বই আট-পেজি ডিমাই-এ ছাপানোই এখন রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেছে, যদিও রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার বই ১৬-পেজি ডবল ক্রাউনে। কিন্তু রয়্যালের চেহারাটা এখনকার কবিদের মনে পড়ে না কেন? হয়তো এখন মনে পড়বে—'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' হাতে নেবার পর। সত্তর-আশি পাতার কবিতার বই ফুলস্কেপে ছাপলে কেমন দেখাবে? মন্দ হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

[ছোটোদের বই তো ফুলস্কেপে এক-শো বার ছাপা উচিত। গল্পের বই তো বটেই, ইস্কুলের পড়ার বইও। বিশেষ করে নিচু-ক্লাসের বই। আপনার মত কী?

আমার পুরোপুরি সমর্থন আছে। বাঁধা রাস্তায় চলায়

ঝামেলা নেই। কিন্তু খুঁজে-পেতে নোতুন রাস্তা বার করবার ইচ্ছেটাকে মরতে দেওয়া উচিত নয়।

[আমরা কিন্তু আসল কথা ভুলে যাচ্ছি—

হ্যাঁ, কাজের কথায় আসি। বলছিলাম, পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে প্রথম কাজ হলো, বইয়ের সাইজ ঠিক করা।

তারপর ঠিক করতে হবে, কোন জাতের কাগজে বই ছাপা হবে। বাজারের খবর জানা থাকা চাই—যে-কাগজ চাইছি বাজারে সেই কাগজের জোগান আছে কিনা, দাম কতো। বাজারে সব সময়ে প্রকাশক-পোষা দরে মনের মতো কাগজ পাওয়া যায় না।

বইয়ের সাইজ ঠিক হলো। কাগজের জাত ঠিক হলো। বাকি থাকলো কী ?

হিসেব করতে হবে, ছাপলে বইটা ক পাতায় দাঁড়াবে।

[সে কি আগের থেকে হিসেব করা যায় ?

আন্দাজ করা যায়—ষোলো আনা না হোক পনেরো আনা। সোজা নিশানা। মনে করো, পাণ্ডুলিপিটা ২০০ পৃষ্ঠার। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় গড়ে ২০ লাইন, প্রত্যেক লাইনে গড়ে ১০টি শব্দ। পাণ্ডুলিপিতে মোট শব্দসংখ্যা দাঁড়ালো কতো ? ২০ × ১০ × ২০০ = ৪০,০০০।

মনে করো, আট-পেজি রয়্যাল সাইজের বই। পাতার সাইজ ২৪ × ৪২ এম। তাহলে মেপে দেখো—প্রত্যেক পাতায় ক লাইন ধরে।

[২৫ লাইন : প্রত্যেক লাইনে গড়ে আটটা শব্দ ধরতে পারে।

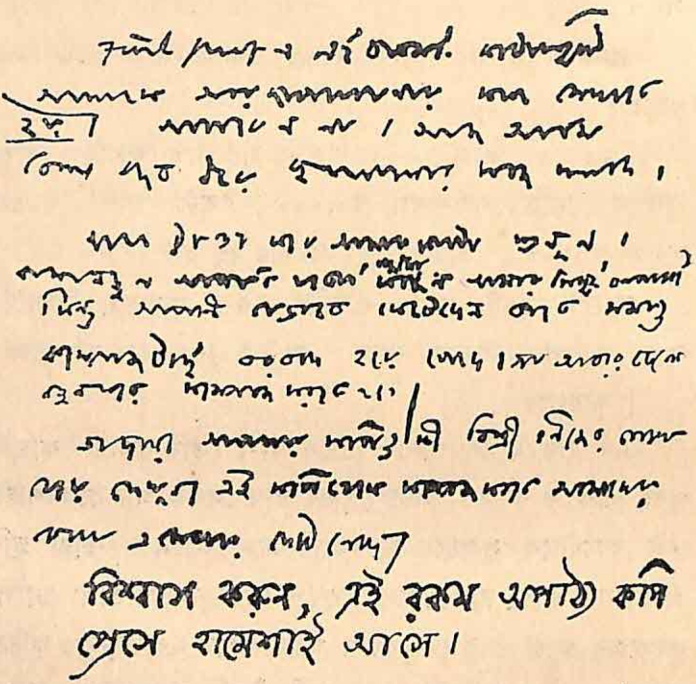
প্রত্যেক ছাপা পাতায় তাহলে গড়ে কটা করে শব্দ ধরছে ?

[২৫×৮, অর্থাৎ ২০০। দাঁড়ান, বার করে ফেলছি। পাণ্ডু-লিপির মোট শব্দসংখ্যা ৪০,০০০÷একটা ছাপা পাতার শব্দসংখ্যা ২০০। অর্থাৎ, ২০০ পাতার বই হবে।

আরো আটটা পাতা বাড়তি নাও : নামপত্র, উৎসর্গের পাতা, সূচীপত্র এইসবের জন্যে। মোট ২০৮ পাতার বই হলো।

[অতঃপর ?

এর পর কাজ হলো : প্রেস কপি তৈরি করা। কাজটা খুবই দরকারি কাজ। অথচ বেশির ভাগ লেখক আর প্রকাশকই এই কাজটাকে সবচেয়ে অদরকারি মনে করেন। তাঁরা ছবি আঁকানোর জন্যে, রঙচঙে মলাট করার জন্যে, ভালো ছাপা ভালো কাগজের জন্যে দু হাতে পয়সা খরচ করতে এতোটুকুও কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু পরিচ্ছন্ন প্রেস কপি তৈরি করার জন্যে পয়সা খরচ করতে বললে তাঁদের ব্যবসাবুদ্ধি টনটনে হয়ে ওঠে, লাভ-লোকসানের হিসেব বোঝাতে আসেন। কিন্তু তুমি যদি বই-ছাপাকে একটা শিল্প বলে স্বীকার করো তা হলে এ-কাজটাকে কিছুতেই অবহেলা করতে পারবে না। কেন পারবে না ? পাশাপাশি দুটো লেখা তোমার সামনে রাখছি, নিজেই বিচার করো।



এই হিজিবিজি নোঙরা পাণ্ডুলিপি ছাপতে পাঠানো যায় না। ছাপাখানায় যাঁরা লেখা পড়ে-পড়ে হরফ গাঁথেন, এই রকম নোঙরা লেখা পড়তে তাঁদের খুবই কষ্ট হয়, অজস্র ভুল হয়, অনেক কথা বাদ পড়ে যায়। যেটা সিকি ঘণ্টায় সারবার কথা তাতে লেগে যায় আধ ঘণ্টা। এই হলো প্রথম দফায় সময় নষ্ট। তারপর যদি কথা বাদ পড়ে যায়, তাহলে সেই

ধ্বজদণ্ড রথের ভিতর থেকে উঠত, রথী আহত হলে ধ্বজদণ্ড ধরে নিজেকে সামলাতেন। দ্বৈরথযুদ্ধের পূর্বে বাগ্‌যুদ্ধ হত, বিপক্ষের তেজ কমাবার জন্য দুই বীর পরস্পরকে গালি দিতেন এবং নিজের গর্ব করতেন। বিখ্যাত রথীদের চতুর্দিকে রক্ষী যোদ্ধারা থাকতেন, পিছনে একাধিক শকটে রাশি রাশি শর ও অন্যান্য ক্ষেপণীয় অস্ত্র থাকত। সম্ভবত পদাতি সৈন্য ধনুর্বাণ নিয়ে যুদ্ধ করত না, তাদের বর্ম থাকত না; এই কারণেই রথারোহী বর্মধারী যোদ্ধা একাই বহু সৈন্য শরাঘাতে বধ করতে পারতেন।

আদিপর্ব ১-পরিচ্ছেদে মহাভারতকথক সৌতি বলেছেন, 'কয়েকজন কবি এই ইতিহাস পূর্বে বলে গেছেন, এখন অপর কবিরা বলছেন,, আবার ভবিষ্যতে অন্য কবিরা বলবেন। এই শ্লোকোক্ত কবিদের অনেকে মহাভারতের একটি শোধনের চেষ্টা করেছেন। মহাভারতের দুষ্মন্ত ইচ্ছা ক'রে শকুন্তলার অপমান করেছেন, কিন্তু কালিদাসের দুষ্মন্ত শাপের বশে না জেনে করেছেন। মহাভারতের কচ দেবযানীকে প্রত্যভিশাপ দিয়েছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কচ পরম ক্ষমাশীল। কাশীরাম দাসের গ্রন্থে এবং বাংলা নাটকে কর্ণচরিত্র সংশোধিত হয়েছে।

মহাভারতের আখ্যান ও উপাখ্যানগুলি দু-তিন হাজার বৎসর ধ'রে এদেশের জনসাধারণকে মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব শিখিয়েছে এবং কাব্যনাট্যাদির উপাদান যুগিয়েছে। মহাভারতের বহু শ্লোক প্রবাদ রূপে সুপ্রচলিত হয়েছে। মহাভারতীয় নরনারীর চরিত্রে কোথায় কি অসংগতি বা ত্রুটি আছে লোকে তা গ্রাহ্য করে নি, যা কিছু মহৎ তাই আদর্শরূপে পেয়ে ধন্য হয়েছে। সেকাল আর একালের লোকাচারে অনেক প্রভেদ, কিন্তু মহাভারতে কৃষ্ণ

বাদ-পড়া কথাগুলো বসাবার জন্যে লাইনগুলোকে ঢেলে সাজাতে হয়। অর্থাৎ ডবল খাটুনি, অযথা সময় নষ্ট, প্রেসের কাজে বিশৃঙ্খলা, আর্থিক ক্ষতি। চোখ চেয়ে সত্যি-মিথ্যে দেখো—

দয়া করে আমাদের কথা একটু ভাববেন।
কাজ করি একটু যদি দেখে যান তাহলে
আমাদের ওপর দয়া হবে, আপনাদের লেখা
যতোটা পারা যায় পরিষ্কার করে লেখবার
দরকারটা হয়তো বুঝবেন। ইতি জনৈক

দয়া করে আমাদের কথা একটু ভাববেন।
আমরা কী অবস্থার মধ্যে কাজ করি একটু
যদি দেখে যান তাহলে আমাদের ওপর দয়া
হবে, আপনাদের লেখা যতোটা পারা যায়
পরিষ্কার করে লেখবার দরকারটা হয়তো
বুঝবেন। ইতি জনৈক কম্পোজিটার

দেখো, দ্বিতীয় লাইনে 'আমরা কী অবস্থার মধ্যে' এই চারটে শব্দ বাদ পড়ে যাওয়ার জন্যে প্রত্যেকটা লাইনকে আবার নোতুন করে গাঁথতে হলো। শব্দ বাদ পড়ার জন্যে আগেকার পাঁচ লাইনের জায়গায় ছ লাইন হলো।

সেইজন্যেই পাণ্ডুলিপি অপরিচ্ছন্ন হলে পরিষ্কার করে নকল করে দিতে হবে। তারপর প্রেসে যাবে। লেখক যদি নিজে না নকল করেন তাহলে এমন একজনকে দিয়ে নকল করানো উচিত

যাঁর হাতের লেখাটি সুন্দর না হলেও গোটা-গোটা,

ঝরঝরে পরিষ্কার,

যাঁর বানানের জ্ঞানটি পাকা,

কমা-দাঁড়ি ইত্যাদি যতিচিহ্নের ব্যবহার যাঁর ভালো করে জানা,

বাঙলা আর সংস্কৃত সমাসের নিয়মগুলো যাঁর

ভালো করে জানা আছে,

[সমাসের নিয়ম জানাটা কি এতোই দরকারি ?

ভীষণ দরকারি। সমাসের জ্ঞান থাকলে তুমি কপি করতে গিয়ে কক্ষনো লিখবে না—বিদ্যুৎ চঞ্চু বিদ্ধ, তোমার কলম দিয়ে বেরোবে—বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ ; কক্ষনো ভুলেও তুমি লিখবে না জল তোলা বালতি, তোমার কলম দিয়ে বেরোবে জলতোলা বালতি।

[বুঝলাম। বানানের জ্ঞান পাকা করার জন্যে কী করা দরকার ?

এক, সংস্কৃত ব্যাকরণের ণত্ব-বিধান আর ষত্ব-বিধান পাখি-পড়া করে মুখস্থ করতে হবে,

দুই, 'চলন্তিকা' অভিধানের শেষে বানানের যে নোতুন নিয়মগুলো দেওয়া আছে সেগুলোকে বারবার পড়তে হবে, মনে রাখতে হবে,

তিন, সব সময়ে হাতের কাছে অভিধান রাখতে হবে, সন্দেহ হলেই কুঁড়েমি না করে অভিধান খুলে সঠিক বানানটি জেনে নিতে হবে।

[নোতুন বানানের নীতিটি কি ?

প্রথম কথা, যে-শব্দটি খাঁটি সংস্কৃত শব্দ, সে-শব্দের বানান সংস্কৃতব্যাকরণমতে হবে। সংস্কৃতমতে ভয়ংকর ভয়ঙ্কর, সংগীত সঙ্গীত,—দুই বানানই শুদ্ধ। কিন্তু সংগে, গংগা অশুদ্ধ—লিখবে গঙ্গা, সঙ্গে।

দ্বিতীয় কথা, যে-শব্দ খাঁটি সংস্কৃত শব্দ নয়,—সংস্কৃত-ভাঙা বা খাঁটি বাঙলা শব্দ—সে-শব্দে সংস্কৃত ব্যাকরণের আইন খাটবে না। সোণা, কাণ, রাণী, কোরাণ, দরুণ—কোনোটাই খাঁটি সংস্কৃত শব্দ নয়, সুতরাং ঠিক বানান হবে—সোনা, কান, রানী, কোরান, দরুন।

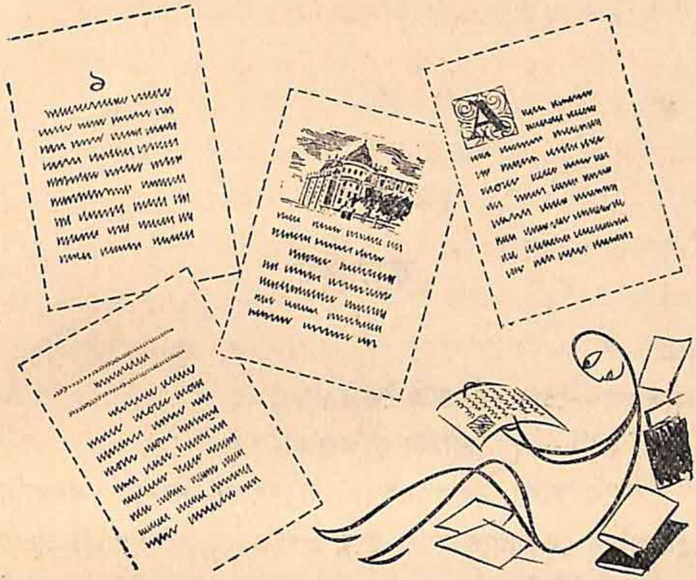
তেমনি পাখি, বাড়ি, কুমির, উনিশ, পুব—এগুলো সব সংস্কৃত-ভাঙা শব্দ, সুতরাং উচ্চারণ-অনুযায়ী বানান। পাখী, বাড়ী, কুমীর, ঊনিশ, পূব কদাচ লিখিবে না। ঠিক বানান—জমিদারি, পাগলামি, ফাঁসি, ঘাঁটি।

তৃতীয় কথা, অনর্থক হসন্ত-চিহ্ন দেবে না—চল্‌তি বুলি, মাল্‌দাই, আম, জান্‌বার কথা না লিখে, লিখবে—চলতি, মালদাই, জানবার।

চতুর্থ কথা, আরবী-ফারসী শব্দ উচ্চারণ-অনুযায়ী হবে—শখ, শহর, শর্ত, শুরু, হুঁশ, দুশমন, নকশা ইত্যাদি।

আরো অনেক কথা আছে। আপাতত এই চারটি কথা ভালো করে বুঝে রাখো।

[অতঃ কিম ? প্রেস ?



কাঠামো

কাঠামো

অতঃপর—প্রেস নয়, ডামি তৈরি।

[ডামি—? ডামিটা কী বস্তু?

ডামি হলো নকল বই। বা বইয়ের নকল। বইখানি যে-সাইজে যে-কাগজে ছাপা হবে, ছাপার পর ঠিক যেমনটি বাঁধাই হবে, মলাটটি ঠিক যেমন হবে,—এক কথায় ছাপার পর বইটি যেমন দেখতে হবে ঠিক তেমন একটি বই তৈরি করে ফেলতে হবে। সবই ঠিক ছাপা বইয়ের মতো, কেবল ভেতরের পাতাগুলো আছাপা শাদা।

[এবার তো বেশ হাঙ্গামায় পড়া গেলো দেখছি।

হাঙ্গামা কিচ্ছু নেই। যে-কাগজে বই ছাপবে বলে ঠিক করলে সেই কাগজেরই তু-এক দিস্তে দপ্তরির হাতে দিয়ে তাঁকে শুধু বুঝিয়ে দাও কী সাইজে কতো পাতার বই হবে, কী রকম সেলাই-বাঁধাই-মলাট হবে—তিনিই চার-পাঁচখানা ডামি তৈরি করে তোমার টেবিলে এনে হাজির করবেন।

[বেশ হাজির করলেন। ঐ নকল বইগুলো দিয়ে এখন আমি করবো কী?

একখানা ডামি খোলো। মলাটের নিচে প্রথমেই যে পাতাখানা পাচ্ছো, সেই পাতাটার নাম পুস্তানি। এই পাতাটা ছাপাখানা তৈরি করে দেয় না—দপ্তরি এই পুস্তানির কাগজ দিয়ে সেলাই-করা ছাপা বইয়ের গোছের সঙ্গে মলাটের বোর্ডকে বইয়ের সামনে আর পেছনে একত্র সেঁটে দেয়। পুস্তানির কাগজ সাধারণত আছাপা শাদাই দেওয়া হয়, তবে কোনো কোনো বইয়ে আলাদা ছাপিয়ে নেওয়া হয়। মনে করো, ছোটোদের জন্যে শিকারের গল্পের বই ছাপাচ্ছো—পুস্তানিতে নানারকম শিকারের জন্তুর ছবি যদি ছাপিয়ে দাও, ছোটোদের চোখে ভালোই লাগবে।

পুস্তানি উলটে দাও। এইবার যে-পাতাটা এলো সেই পাতা থেকে বইয়ের শুরু। এই পাতাটার ওপর পেনসিল দিয়ে ছাপা জায়গার মাপটা ছকে নাও। প্রত্যেক পাতাতেই এই-ভাবে ছাপা জায়গার মাপটা ছকে দেখিয়ে দিতে হবে।

[বলেন কী?

সোজা উপায় বলে দিচ্ছি। ছাপা জায়গার চারটে কোণ পিন দিয়ে ফুটো করে যতোদূর ভেতরে পারো চালিয়ে দাও। আরো কয়েকটা পাতায় চারটে করে বিন্দু পেলে তো! এখন এই বিন্দুগুলোকে লাইন টেনে জুড়ে দিলেই কাম ফতে। ঠিক কি না?

এখন আবার পিছন ফিরে সেই শুরু'র পাতায় ফিরে এসো।

এই পাতাটার নাম 'রক্ষাপত্র' (বাসটার্ড টাইট্‌ল্)—এই পাতাটা এর ঠিক পরের পাতাটাকে রক্ষা করে বলে এই নাম দেওয়া হলো। এর ঠিক পরের পাতাটা হলো 'নামপত্র' (টাইট্‌ল্ পেজ) বইয়ের খুব দরকারি পাতা। কেননা এই পাতায় বইয়ের নাম, লেখকের নাম, প্রকাশকের নাম-ধাম-ঠিকানা লেখা থাকে। এই পাতাটার ওপরে যদি আরেকটা পাতা না থাকে, তাহলে বই বাঁধাই হবার সময় এই পাতাটা সব-ওপরে থাকার জন্যে ময়লা হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া, বই পাঁচহাতে নাড়াচাড়া হতে-হতে প্রথম পাতাটাই জখম হয় বেশি—আলগা হয়ে খুলে পড়ে যেতে পারে। 'নামপত্র' যদি বইয়ের প্রথম পাতা হয়, আর এই দরকারি পাতাটা কোনোভাবে খুলে পড়ে যায়, তাহলে বইটার ভীষণ ক্ষতি হয়। তাই 'নামপত্র'কে রক্ষা করার জন্যে 'রক্ষাপত্র' দেওয়া হয়—সেইটাই বইয়ের প্রথম পাতা।

রক্ষাপত্রে কী ছাপা হবে ? ছোটো হরফে শুধু বইয়ের নামটুকু—আর কিচ্ছু নয়।

[কোন জায়গায় ছাপা হবে ?

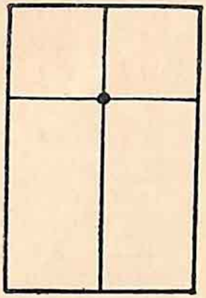
পাতাটার দৃষ্টিকেন্দ্রে।

['দৃষ্টিকেন্দ্র' কথাটা তো আগে শুনি নি।

এখন শোনো। শোনা নয়, দেখো—

দেখো দৃষ্টিকেন্দ্রটা ঠিক কোথায় পড়ে।

পাতার খাড়াই দিকটাকে সমান দু ভাগে ভেঙে লাইন টেনে দাও। তারপর শোয়া দিকটাকে সমান তিন ভাগে ভাঙো।



দৃষ্টিকেন্দ্র

মাথা থেকে তিন ভাগের এক ভাগ দূরে যে-কেন্দ্রটি, সেইটিই দৃষ্টিকেন্দ্র।

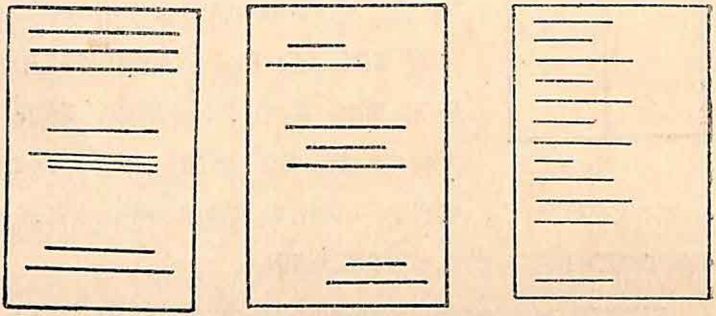
রক্ষাপত্র উলটে দাও। রক্ষাপত্রের উলটো পিঠ একেবারে শাদা থাকবে—কিচ্ছু ছাপা হবে না। কোনো কোনো বইয়ে অবশ্য ছাপা হয়—ছোটো হরফে লেখকের অন্য-অন্য বইয়ের একটা ফর্দ। এইবার বেরোলো 'নামপত্র'। নামপত্রে থাকবে নাম—বইয়ের নাম, লেখকের নাম, প্রকাশকের নাম-ধাম।

নামপত্রে শাদা-কালোর সমস্যাটা একটু অন্যভাবে আসে। ভেতরের দিকে বাঁহাতি-ডানহাতি দুটো পাতাকে আমরা একসঙ্গে ধরি। কিন্তু নামপত্রটাকে একটা স্বাধীন ডানহাতি পাতা হিসেবে ধরতে হবে।

নামপত্রে তলার আর মাথার জায়গা ভেতরের পাতার সমান-সমান রাখাই ভালো, তবে খুব সামান্য একটু ইতরবিশেষ হলে তেমন বেমানান হয় না। বাঁ পাশের মার্জিন বইয়ের ভেতরের পাতার চেয়ে দু-এক এম বাড়িয়ে দেওয়া ভালো ; তার ফলে ডান পাশের মার্জিন সামান্য একটু কমবে।

নামপত্রে লেখার বিষয় সামান্য। কিন্তু সেই সামান্য লেখা-গুলোকেই টাইপের রকমফের করে, শাদা-কালোর দূরত্ব আর ওজন কমিয়ে-বাড়িয়ে, পাতার দু পাশে বা চার পাশে শাদামাটা

বা নকশি বর্ডার দিয়ে—কতো বিচিত্র সুন্দর রূপে যে সাজানো যায়, তা বলে শেষ করা যায় না।

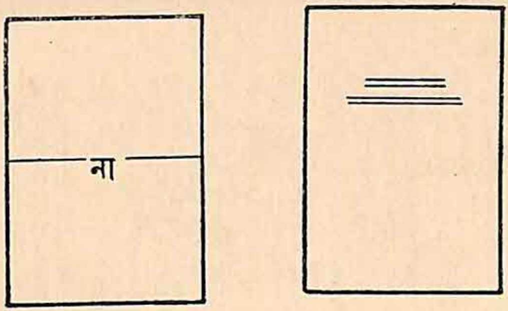


জাতপত্রের নমুনা

নামপত্রের উলটো পৃষ্ঠাটা হলো 'জাতপত্র'। বই প্রথম কবে প্রকাশিত হয়েছে, এ-পর্যন্ত কটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, কে প্রকাশ করেছেন, কে প্রচ্ছদপট এঁকেছেন, কোথায় ছাপা হয়েছে কোন দপ্তরিখানায় বাঁধাই হয়েছে, বইয়ের দাম কতো—বইছাপার এই সমস্ত ইতিহাস এই জাতপত্রে ছাপিয়ে দেওয়া হয়। এই জাতপত্র নানানভাবে সাজানো হয়।

এর পরে উৎসর্গপত্র। লেখাটি দৃষ্টিকেন্দ্রের কাছাকাছি রাখতে হবে। এর উলটো পিঠ শাদা।

এর পরে সূচীপত্র। মাথার মার্জিনের সীমা ছাড়িয়ে দু-চার এম নিচে নেমে সূচীপত্রের লেখা শুরু করা উচিত।



এখানে নয়, উৎসর্গপত্র এইখানে ছাপাতে হবে

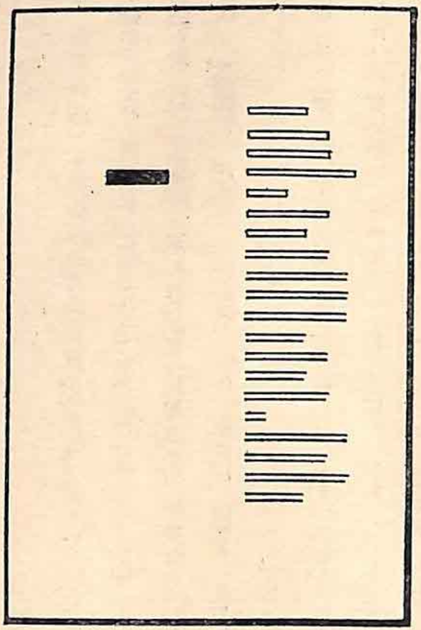
সূচীপত্রের পর চিত্রসূচী (অবশ্য যদি বইয়ে বেশি ছবি থাকে)।

তারপরে ভূমিকা। ভূমিকা সব সময়ে ডানহাতি পাতায় শুরু করতে হবে।

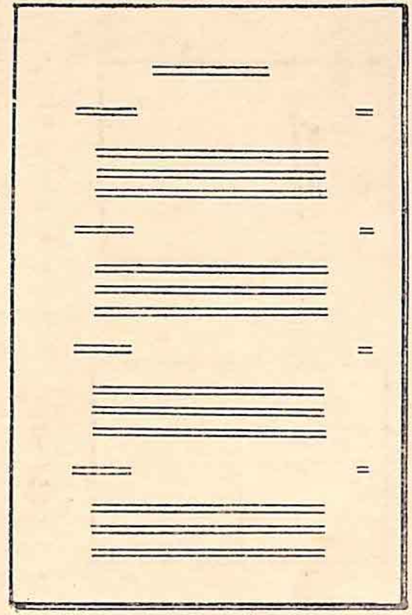
ভূমিকার পর 'অনুনামপত্র' (হাফ্-টাইট্ল্)—বইয়ের আসল লেখা শুরু হবার ঠিক আগের ডানহাতি পাতাটা হলো অনুনামপত্র।

এর পরে আসল বই—বইয়ের প্রথম পাতা। প্রথম পাতাটির মাথায় একটু শাদা জায়গা রাখা উচিত ; যে-যে পাতায় অধ্যায় শুরু,—অর্থাৎ বইয়ের এক-একটা নোতুন অংশ শুরু,—সেই সেই পাতাই এইভাবে মাথায় একটু জায়গা ছেড়ে শুরু করা উচিত।

[আচ্ছা, বইয়ে যদি ছবি থাকে ? পাতার মধ্যে ছবি কেমন-ভাবে সাজানো উচিত ?



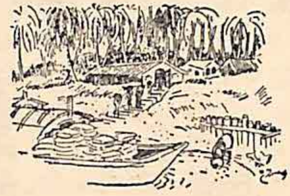
কবিতার বইয়ের সূচীপত্র



প্রবন্ধের বইয়ের সূচীপত্র

এখন রেহানদার রেহানি দলিলটি ভদ্রলোকের কাছে বিক্রি করতে রাজি আছে, তাঁর কেনা উচিত কি না এবং কিনলে কিরকম নালিশ রুজু করতে হবে। ব্যাপারটি কিছুই অসাধারণ নয়; এ রকম হামেশা ঘটছে। ভদ্রলোককে তাঁর করণীয় সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া গেল।

আটটা বেজে গেছে, আমার খাবার তৈরি। এ রাত্রে স্টিমার যখন পদ্মায় পড়বে তখন সম্ভব ঘুমিয়ে থাকব। আর যদি জাগি-ও, অন্ধকারে কিছু দেখা যাবে না। আজ অমাবস্যা।



২৬ ডিসেম্বর ১৯৩৫

খুব ভোরে কেবিন থেকে বেরিয়েই পদ্মার সঙ্গে চোখাচোখি হল। আকাশ নীলাভ ধূসর, পুবে অল্প লাল রং; ভোরের অস্পষ্ট আলোতে তার সমস্তটার ছায়া পদ্মার জলের উপর রহস্যের যবনিকার মতো কাঁপছে। স্টিমার ডান পাড় ঘেঁষে চলেছে; বাঁয়ে চক্রাকারে শীতের পদ্মার প্রশান্ত বিস্তার, বহুদূরের তরুশ্রেণীর আবছায়া কালো রেখায় সীমানা টানা। কুয়াশা প্রায় নেই। নৌকার চলাচল আরম্ভ হয়েছে। সামনে কিছু দূরে একখানা নোঙর-করা স্টিমার দেখা যাচ্ছে।

সূর্যোদয়ের পর থেকেই কিছু কিছু কুয়াশা জমতে আরম্ভ করেছে। বেলা সাতটার পর সাদা কুয়াশা এতটা ঘন হয়ে এল যে, বাঁ পাড়ে একটা জায়গায় স্টিমার বাঁধতে হল। উঁচু পাড়। সামনেই একটা ছোট বসতি। খান সাত-আটেক খড়ের ঘর; দুখানা টিনের। কয়েকটা খড়ের গাদা। গোটা-দশেক গোরু গোল হয়ে খুব নিবিষ্টমনে জাব খাচ্ছে। নদী আর বসতির মাঝের জমিটুকুতে দুটি কলাঝোপ,

কোথাও বা ধানখেত জলে আধো ডোবা,
তারি 'পরে রোদ পড়ে, কিবা তার শোভা।
ডিঙি চ'ড়ে আসে চাষী, কেটে লয় ধান,
বেলা গেলে গাঁয়ে ফেরে গেয়ে সারি গান।
মোষ নিয়ে পার হয় রাখালের ছেলে,
বাঁশে বাঁধা জাল নিয়ে মাছ ধরে জেলে।
মেঘ চলে ভেসে ভেসে আকাশের গায়,
ঘন শেওলার দল জলে ভেসে যায়।





চতুর্থ পাঠ

বিনিপিসি, বামি আর দিদি ঐ দিকে আছে। ঐ যে তিন জনে ঘাটে যায়।

বামি ঐ ঘটি নিয়ে যায়। সে মাটি দিয়ে নিজে ঘটি মাজে। রানীদিদি যায় না। রানীদিদি ঘরে। তার যে তিনদিন কাশি। তার কাছে আছে মা, মাসি আর কিনি।

চলো ভাই নীলু। এই তালবন দিয়ে পথ। তার পরে তিলখেত। তার পরে তিষিখেত। তার পরে দিঘি। জল খুব নীল। ধারে ধারে কাদা। জলে আলো ঝিলিমিলি করে। বক মিটিমিটি চায় আর মাছ ধরে।

দুখানা ছবিওয়ালা পাতার নমুনা দেখাচ্ছি। ভালো করে দেখো, বারবার দেখো। শেখো। আরো শেখো। আরো আরো বই দেখে-দেখে শেখো। শুধু বাঙলা বই নয়, যে-ভাষার যে-বই হোক, হাতে এলেই শিক্ষার্থীর চোখ নিয়ে উলটে-পালটে দেখবে। ছবি নানা রকমের হয়: কলমে-আঁকা ছবি, কাঠ-খোদাই ছবি, লিনোখোদাই ছবি, জলরঙের ছবি, ফটোগ্রাফ। এই নানান ধরনের ছবিকে বুঝতে হবে।

ভেতরের পাতার সাব-হেডিং কেমন হতে পারে, তার কয়েকটা নমুনা দেখিয়ে এই আলোচনা শেষ করবো।

গাছের পাতার ঘাম?

এইবারে এসো আরো একটা পরীক্ষা করা যাক। সেই পরীক্ষা থেকে পাতদের আরো এক কীর্তি দেখতে পাওয়া যাবে।

মাঝখানে

মামার বাড়ির গল্প

এতোক্ষণ তো পৃথিবী, পৃথিবীর আর-সব ভাইবোন আর ওদের মা সূর্যের গল্প শুনলে। এইবার সূর্যের ভাই-বোনদের গল্প বলি শোনো।

বাঁ ধারে

গ্রামদেবতা বাঙলার গাঁয়ে গাঁয়ে লোকালয়ের বাইরে খোলা জায়গায় কিংবা গাছের ছায়ায় একটা করে স্থান বা 'থান' থাকে—সেখানে থাকেন গ্রাম-দেবতা। কোথাও কোথাও গ্রামদেবতার বিগ্রহ থাকে, কোথাও থাকে না। এই সব জায়গায় পশুপাখি বলি দেওয়া হয়। লোকে গ্রামদেবতার নামে মানত করে, তাঁকে খুশি রাখার চেষ্টা করে। এই গ্রামদেবতা কোথাও

বাক্‌স করে

এতোক্ষণে ডামির কাজ শেষ হলো। ডামি হলো মুদ্রকের 'ব্লু প্রিণ্ট': এঞ্জিনীয়র যেমন বাড়ি তৈরির আগে একখানা নীল কাগজে শাদা কালিতে একটা নকশা আঁকিয়ে নেন, সেই নীল নকশা দেখে-দেখে রাজমিস্ত্রি-ছুতোরমিস্ত্রিরা বাড়িখানা বানিয়ে ফেলে, ঠিক তেমনি মুদ্রকের ডামি দেখে-দেখে পাঁচহাতে বইখানা তৈরি হয়ে উঠবে।

[এবার প্রেস ?

হ্যাঁ, কপি আর ডামি ঝোলায় ফেলে চলো এবার স্বপ্না প্রেসে যাই।



অক্ষরে অক্ষরে

অক্ষরে অক্ষরে

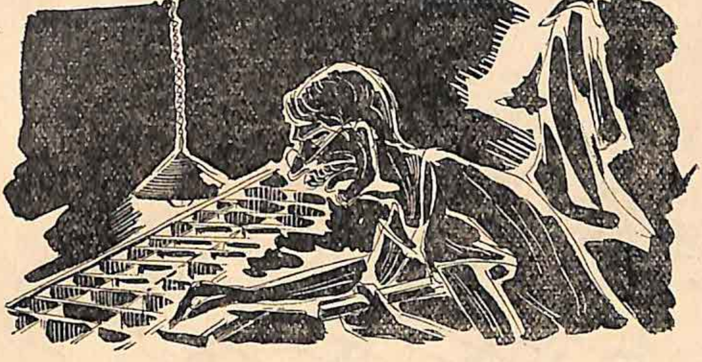
স্বপ্না প্রেসের আপিস দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। এমন সুন্দর ছিমছাম আপিস যে-ছাপাখানার—

[তার কারখানার জিনিসও নিশ্চয়ই ঝকঝকে সুন্দর হবে।

লোকমুখে সে রকম শুনেই তো এখানে আসা। এসো না, চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়ে যাক।

ম্যানেজারের হাতে কপি আর ডামি দিয়ে চলো আমরা অন্দরে ঢুকি। 'প্রবেশ নিষেধ' নোটিসটাকে আপাতত গ্রাহ্য না করলে চলবে—আগে থেকে বলে-কয়ে নেওয়া আছে।

এই মস্ত হলটা হলো কম্পোজিং রুম। এই যে এঁরা এখানে সার দিয়ে বসে-দাঁড়িয়ে কাজ করছেন, এঁরা হলেন কম্পোজিটর—এঁরা কম্পোজ করেন, তার মানে অক্ষর গাঁথেন। এসো, একটু কাছে গিয়ে খুঁটিয়ে দেখি, কীভাবে অক্ষর গাঁথার কাজটা হয়।



কী কম্পোজ করছেন মানিকবাবু ?

[২২ এম পাইকায় একটা বই।

আপনাদের কাজ দেখতে এসেছি। আপত্তি হবে না তো ?

[আপত্তি হবে কেন ? আপনারা যাঁরা কাজ করান তাঁরা যদি প্রেসের কাজকর্ম দেখেন-শোনেন-বোঝেন তাতে প্রেসেরই ভালো, আখেরে আমাদেরই লাভ।

নির্ভয় হওয়া গেলো। এসো মুদ্রক, কানের কাছে না থেকে আমরা একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াই।

আচ্ছা দেখো, মানিকবাবুর হাতের সামনে, তার একটু ওপরে, বাঁ দিকে আর ডান দিকে চারখানা খোপকাটা কাঠের ডালা। এগুলোকে বলে 'কেস'। কেস চারখানা একখানা কাঠের ফ্রেমের ওপর বসানো।



কেসের এই খোপগুলোর মধ্যে অক্ষর থাকে : অ-আ ক-খ ইত্যাদি। প্রেসে এই ছাপার অক্ষরগুলোকে বলা হয় 'টাইপ'।

টাইপ তৈরি হয় সিসে দিয়ে। সবটাই সিসে নয় অবশ্য। সিসের সঙ্গে কিছুটা অ্যান্‌টিমনি ধাতু (২৩%) আর টিন (১২%) মেশাতে হয়। কেন? সিসে নরম ধাতু—অ্যান্‌টিমনি মেশালে শক্ত হয়, আর টাইপের ছাঁদটাও বেশ চোখা হয়ে ফোটে।

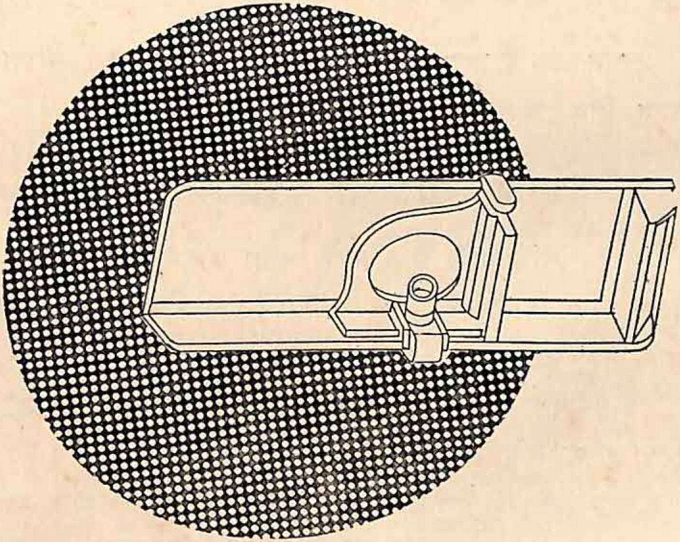
লক্ষ্য করে দেখো, খোপগুলো সব এক রকম নয়—মাপে

ছোটো-বড়ো আছে। যে-টাইপগুলো বেশি দরকার হয় সেগুলোর জন্যে বড়ো খোপ।

[আচ্ছা, চারটে কেসে মোট খোপ কটা ?

মোটমাট ৪৫৪টা--স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, যুক্তবর্ণ, কমা-দাঁড়ি সব মিলিয়ে এর মধ্যে আছে ৫৬৩টি টাইপ।

নজর করে দেখো—কী করে অক্ষর গাঁথা হচ্ছে অর্থাৎ কপি কম্পোজ করা হচ্ছে। মানিকবাবুর বাঁ হাতে ধরা রয়েছে একখানা পেতলের পাত। পিতলের এই পাতখানাকে বলে 'স্টিক'। তর্জনী আর বুড়ো আঙুলে করে কেস থেকে টাইপ তুলে নিয়ে এসে স্টিকের ওপর পরের পর সাজিয়ে রাখা হচ্ছে।



দেখো, স্টিকের ওপর একটা লাইন প্রায় গাঁথা হয়ে এলো—এইবার দেখো মানিকবাবু কী করেন।

[লাইনের এখানে-ওখানে টাইপ গুঁজছেন। কেন, আবার গুঁজছেন কেন ?

উনি লাইন জাস্টিফাই করছেন।

[তার মানে ?

শোনো মন দিয়ে। লাইনে শব্দের মাঝে মাঝে ফাঁক দিতে হয় নিশ্চয়ই বোঝো। ঐ ফাঁক দেবার জন্যে কম্পোজিটরের কেসে আছে নানান মাপের ছোটো ছোটো সিসের টুকরো। তাকে বলে 'স্পেস'। স্পেস টাইপের চেয়ে মাথায় একটু খাটো হয়।

স্পেস এক মাপের নয়, পাঁচ মাপের—থিন স্পেস, মিডল স্পেস, থিক স্পেস, আধ এম, এক এম।



লাইন জাস্টিফাই করা মানে, যতো এম মাপে লাইনটাকে গাঁথা হচ্ছে, লাইনটা যেন কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক ততো এম হয়—একটু বড়োও নয়, একটু ছোটোও নয়।

জাস্টিফাই করার সঙ্গে একটা নীতি জড়িয়ে আছে। সেটা হলো সঠিক, স মা ন স্পেসিং।

পাঁচ রকমের স্পেস—কোথায় কখন কীভাবে ব্যবহার করা উচিত, ভালো কম্পোজিটরেরা সেটা খুব যত্ন করে শেখেন।

যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন কম-বেশি স্পেস গুঁজে দিয়ে হাত চালিয়ে কম্পোজ করার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নেই—ক্রমাগত অভ্যাস করতে-করতে অনেকেরই সে জলদ হাত এসে যায়। কিন্তু বরাবর সমান স্পেস রেখে হাত চালিয়ে কম্পোজ যিনি করে যেতে পারেন তাঁকেই বলবো ওস্তাদ কম্পোজিটর।

এই একটা কম্পোজ দেখো। রাম রাম এটা কার হাতের কাজ ম্যানেজার মশাই ? এ কি ছাপার পাতা ? নিশ্চয়ই কোনো অ্যাপ্রেনট্রিস কম্পোজিটরের কীর্তি আর নয় তো কোনো চূড়ান্ত ফাঁকিবাজের দায়সারা কাজ । মনে হচ্ছে শাদার নদীতে যত্রতত্র কালো কালো কতকগুলো টুকরোপিণ্ড ভেসে চলেছে । শ্রী-ছাঁদ বলতে কোথাও কিছু নেই। এর ঠিক আগের প্যারাগ্রাফের ওপর একবার নজর করো,— তফাতটা স্পষ্ট বুঝতে পারবে। ওটা একটা রুচিবান ওস্তাদ কম্পোজিটরের কাজ ।

স্পেস ব্যবহারের ঠিক নিয়মটি কী ? এমনভাবে স্পেস বসাতে হবে যাতে চোখ বলে, প্রত্যেক শব্দের পরে স মা ন ফাঁক আছে।

ভালো কম্পোজিটর কী করেন ? থিক স্পেস বসিয়ে-বসিয়ে কম্পোজ করে যান। যেমন ধরো, ২০ এম-এ কম্পোজ হচ্ছে :

কবি তাঁহার কল্পনা-উৎসের যত করুণাবারি সমস্তই কেবল জ

থিক স্পেস বসিয়ে কম্পোজ করে যেতে-যেতে কম্পোজিটর 'কেবল' পর্যন্ত এসে দেখলেন, পরের কথাটা 'জনকতনয়ার'—

ঐ লাইনে ধরে না ; কথাটাকে ভেঙে 'জনক-তনয়ার' করে নিয়েও 'জনক' কথাটাকে ধরানো যায় না। অথচ লাইন পুরোয় নি।

ভালো কম্পোজিটর চোখের আন্দাজে বুঝে নেবেন—কতোখানি ফাঁক থেকে যাচ্ছে। ১ এম+১ থিক স্পেস।

ঐ জায়গাটাকে এখন গোটা লাইনটার মধ্যে স মা ন ভা বে ছড়িয়ে দিতে হবে। তা করতে হলে এই হিসেবটা মনে রাখতে হবে :

১ এম= {
৫ থিন স্পেস
৪ মিডল স্পেস
৩ থিক স্পেস
২ আধ এম

আচ্ছা লাইনটায় কটা স্পেস পড়ছে ? ৬টা।

১ এম মানে ৫টা থিন স্পেস। সুতরাং, পাঁচটা শব্দের পরে যদি আর-একটা করে থিন স্পেস দিয়ে যাওয়া হয়, আর শেষের শব্দে থিক স্পেস, তাহলেই লাইনটা মাপমতো হবে।

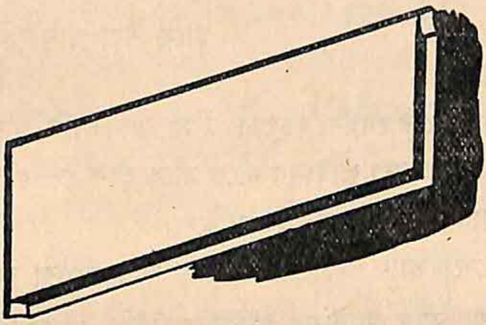
এইভাবে একটা লাইন সঠিকভাবে গাঁথা হয়ে গেলে, লাইনের নিচে লাইনের মাপের তুখানা সিসের পাত দিতে হয়।

তারপর একজোড়া লাইন গাঁথো, একজোড়া সিসের পাত দাও, আবার গাঁথো আবার পাত দাও—এইভাবে টাইপ গাঁথার

কাজ এগোতে থাকে। সাত-আট লাইন গাঁথা হয়ে যাবার পর, স্টিকটা—বাঁ হাতের ঐ পেতলের পাতটা—ভরতি হয়ে যায়।

তখন? স্টিক খালি করে ফেলতে হবে। কী করে?

দু-দিকে-বাটাম-লাগানো কাঠের এই পাটাটা দেখছো তো—একে বলে গ্যালি।



গাঁথা লাইনগুলোকে স্টিক থেকে নামিয়ে ঐ গ্যালির ওপরে রাখতে হয়। গ্যালি তৈরি হয় সাধারণত ভালো সেগুন কাঠ দিয়ে। ইস্পাতের তৈরি গ্যালিরও ব্যবহার আছে। গ্যালি নানা মাপের হয়—

ঐ বুঝি টিফিনের ঘণ্টা বাজলো। এখন আধ ঘণ্টা কাজ বন্ধ। চলো, আমরাও চায়ে চুমুক দিতে-দিতে আলাপ করি।

৩-প লেড

ছায়ার ঘোমটা মুখে টানি
আছে আমাদের পাড়াখানি।
দিঘি তার মাঝখানটিতে
তালবন তারি চারি ভিতে।

৩-প ফাঁকে তো কই খুব খারাপ দেখাচ্ছে না, তাহলে ৬-প লেড দেওয়া হচ্ছে কেন?

তা দেখাচ্ছে না ঠিকই। কারণ কবিতার লাইনগুলো ছোটো ছোটো, টাইপও ১২ পয়েন্টের টাইপ। কিন্তু এই নমুনাটা দেখো—

রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই,
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।
মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে,
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।

রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই,

বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে,

এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।

এই নমুনাটা এবার দেখো। প্রত্যেক লাইনের ওপর-নিচে কতোটা ফাঁক আছে লক্ষ্য করো।

বাংলাভাষাকে চিনতে হবে ভালো ক'রে ; কোথায় তার শক্তি, কোথায় তার দুর্বলতা, দুইই আমাদের জানা চাই।

রূপকথায় বলে, এক-যে ছিল রাজা, তার দুই ছিল রানী, সুয়োরানী আর দুয়োরানী। তেমনি বাংলাবাক্যাধীশেরও আছে দুই রানী—একটাকে আদর করে নাম দেওয়া হয়েছে সাধু ভাষা ; আর-একটাকে কথ্য ভাষা, কেউ বলে চলতি ভাষা, আমার কোনো কোনো লেখায় আমি বলেছি প্রাকৃত বাংলা। সাধু ভাষা মাজাঘষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার-করা অলংকারে সাজিয়ে তোলা। চলতি ভাষার আটপৌরে সাজ নিজের চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা। অলংকারের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর কালিদাসের একটা লাইন তুলে দিলে তার জবাব হবে ; কবি বলেন : কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্। যার মাধুর্য আছে সে যা পরে তাতেই তার শোভা। রূপকথায় শুনেছি সুয়োরানী ঠাঁই দেয় দুয়োরানীকে গোয়ালঘরে। কিন্তু গল্পের পরিণামের দিকে দেখি সুয়োরানী যায় নির্বাসনে, টিঁকে থাকে একলা দুয়োরানী রানীর পদে। বাংলায় চলতি ভাষা বহু কাল ধরে জায়গা পেয়েছে সাধারণ মাটির ঘরে, হেঁশেলের সঙ্গে, গোয়ালের ধারে, গোবর-নিকোনো আঙিনার পাশে, যেখানে সন্ধেবেলায় প্রদীপ জ্বালানো হয় তুলসীতলায় আর বোষ্টমী এসে নাম শুনিয়ে যায় ভোরবেলাতে। গল্পের শেষ অংশটা এখনো সম্পূর্ণ আসে নি, কিন্তু আমার বিশ্বাস সুয়োরানী নেবেন বিদায় আর একলা দুয়োরানী বসবেন রাজাসনে।

এই নমুনাটা দেখে-দেখে কী নীতি স্থির করা উচিত বলো।

[নীতিটি তো বুঝছি এই : টাইপের ছোটোবড়ো আর গাঁথা লাইনের দৈর্ঘ্যের হিসেব করে লাইনের মধ্যেকার ফাঁকের কমি-বেশি স্থির করতে হবে। ছোটো টাইপে কম ফাঁক, কিন্তু সেই ছোটো টাইপেই যদি বেশি লম্বা লাইন গাঁথতে হয় তবে ফাঁক বাড়ানো দরকার। বড়ো টাইপে লাইনের মাঝে বেশি ফাঁক দরকার হয়।

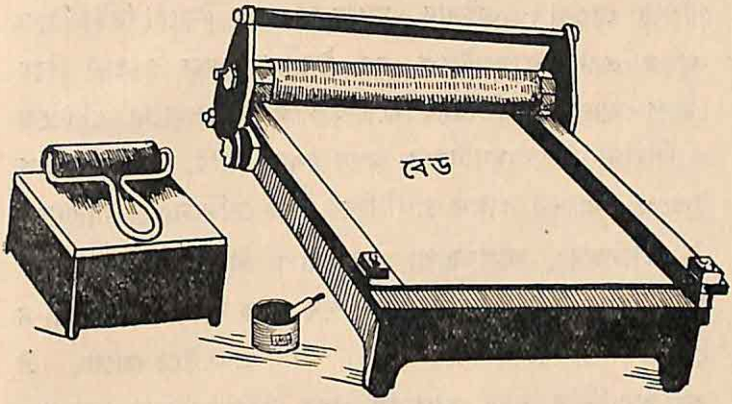
লাইনের ভেতরে আর দুই লাইনের মধ্যে ফাঁক ব্যবহারের নীতিটি বললাম। ইংরিজি বাঙলা ভালো ভালো বই বারবার দেখে-বুঝে নীতিটিকে পাকা করে শিখে নিতে হবে।

লাইনের পর লাইন গাঁথা হয়ে চলে, স্টিক ভরতি হয়ে ওঠে। স্টিকের পর স্টিক ভরতি হয়ে ওঠে, গাঁথা লাইনের সার স্টিক থেকে গ্যালিতে নামে। গ্যালির পর গ্যালি ভরে ওঠে। তখন প্রেস থেকে তোমার কাছে গ্যালি-গ্যালি প্রুফ এসে পৌঁছয়।

[প্রুফ তোলা হয় কী করে ?

খুব সোজা। এসো এই কোণে, স্বচক্ষে দেখে নাও।

কম্পোজিটর গ্যালিগুলোকে দড়ি দিয়ে বেশ মজবুত করে বেঁধে দিয়েছেন। প্রুফম্যান দড়ি-বাঁধা গ্যালিকে প্রুফ-তোলা মেশিনের 'বেড'-এর ওপর—অর্থাৎ এই ইস্পাতের পাতটার



ওপর—ফেলবেন। ফেলতে হবে একটু কায়দা করে, নাহলে গ্যালি ভেঙে গিয়ে কম্পোজিটরের এতো খাটুনি সব মাঠে মারা যাবে। কায়দাটা হলো, গ্যালিটাকে প্রুফ-তোলা মেশিনের বেড-এর কিনারের গায়ে-গায়ে এনে লাগানো, যেন একটুও ফাঁক না থাকে। তারপর একই সঙ্গে,—একটুও আগে-পরে নয়, কাঁটায় কাঁটায় একই সঙ্গে—বাঁ হাত দিয়ে গ্যালিটাকে পিছন দিকে টানা আর ডান হাত দিয়ে দড়ি-বাঁধা টাইপ-লাইনগুলোকে সামনের দিকে ঠেলা—ব্যস, দড়িবাঁধা টাইপ-লাইন ইস্পাতের পাতের ওপর পড়লো। এইবার, ইঙ্‌ক্‌-শ্লাব বা মসৃণ পাথরের পাটার ওপর কালি মেড়ে নিয়ে, একটা শিরিস বা রবারের রোলারে সেই কালি মাখিয়ে নিয়ে, কালিমাখা রোলারটা টাইপ-ম্যাটারের ওপর দিয়ে চাকিতে রুটি বেলার মতো করে কয়েকবার

গড়িয়ে দেওয়া। এইবার, মাপমতো এক টুকরো নিউজপ্রিন্ট কাগজ এনে, কাগজটাকে এক টুকরো ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে মোছা-মোছা করে ভিজিয়ে নিয়ে, কাগজের না-ভেজানো পিঠটাকে কালিমাখা টাইপ-ম্যাটারের ওপর পেতে দিয়ে, তার ওপর এক টুকরো বনাতের কাগজ চাপা দিয়ে, প্রুফ মেশিনের রোলারটাকে ঐ কালিমাখা, কাগজচাপা, বনাতচাপা টাইপ-ম্যাটারের ওপর দিয়ে পেছন দিক থেকে সামনের দিকে এ ক না গা ড়ে, স মা ন জো র দিয়ে টেনে নিয়ে আসা। ব্যস, প্রুফ উঠে গেলো,—ঐ অল্প-অল্প-ভিজে নরম কাগজের ওপর টাইপ-লাইনের ছাপ পড়ে গেলো। বনাতের চাপাটা সরিয়ে নাও তো—দেখো তো কেমন প্রুফ উঠলো--

প্রুফটায় প্রচুর ভুল আছে। ভুলগুলো কাটছি। নজর করে দেখো, প্রুফ দেখার সংকেত-চিহ্নগুলোকে চিনে নাও।

ভুলগুলো শোধরাবার পর, নির্ভুল পাতাটার চেহারাও দেখাবো। দুটো পাতাকে মিলিয়ে দেখলে জিনিসটার আন্দাজ পাবে।

গ্যালির পর গ্যালি প্রুফ উঠছে—প্রুফম্যান গ্যালির পর গ্যালি নামাচ্ছেন ওঠাচ্ছেন, প্রুফ তুলে হেড কম্পোজিটরের হাতে জমা দিয়ে আসছেন, হেড কম্পোজিটর কপি মিলিয়ে-মিলিয়ে প্রুফের ওপর এক-দুই-তিন নম্বর বসিয়ে যাচ্ছেন, ম্যানেজারের টেবিলে স্তূপাকারে প্রুফ জড়ো হচ্ছে, সেখান থেকে কপি আর প্রুফ খামে ভরতি হয়ে প্রকাশকদের দপ্তরে দপ্তরে

চলে যাচ্ছে। সেই প্রুফ পড়া হয়ে, কাটাকুটি হয়ে আবার প্রেসে ফেরত যাচ্ছে—সংশোধনের জন্যে। প্রুফের ওপর বড়ো বড়ো করে লেখা—'প্রেস, দয়া করে আরেকটি গ্যালি প্রুফ পাঠান, তু প্রস্থ'।

প্রেসে প্রুফের সংশোধন হতে থাক। ইতিমধ্যে আমরা বাড়ি ফিরে আজ বাঙলা টাইপগুলোকে চিনে নেবো।

আমি একটা খাতা বানিয়েছি, আজ তোমাকে দেখাবো। সেই খাতায় যতো রকম বাঙলা টাইপ আছে তার প্রত্যেকটির কয়েক লাইন করে নমুনা আছে।

দেখবে, কতো মোটা করে খাতা বানিয়েছি অথচ ভরাতে পেরেছি খাতার মাত্র কয়েকটি পাতা। এইভাবে যদি ইংরিজি বা ফরাসী বা জার্মান টাইপের নমুনা সংগ্রহ করতাম এ রকম তু-তিনখানা খাতা ভরে যেতো।

বাঙলায় টাইপের বৈচিত্র্য নেই। হালে 'ডিস্‌প্লে' টাইপের অর্থাৎ যে-সব টাইপ বিজ্ঞাপনে, খবরের কাগজের হেডিং-এ ব্যবহার করা হয় সেইসব টাইপের বৈচিত্র্য তবু একটু দেখা

প্রুফ পড়া

৩ যাঁরা লেখেন, যাঁধের লেখা চাপার হরফে ছ/
প্রকাশিত হয়, তাঁদের প্রুফ-দেখা অসীভ্যা trs
see copy ^অভ্যাস করলেই শেখা যায়। তিনটি কথা
#/ আছে। প্রুফপড়া। বাঙলা টাইপের খুটি^ খুঁ/ঁ/
টি নাটীগুলি জানা। বানানের জ্ঞান^ ভাষা ও †/,
ণ/ণ ব্যাক রিণের জ্ঞান।

ফ/ এক॥ প্রুভ পড়া আর বই পড়া এক
স/#/ জিনিষ নয়। বই পড়ারসময় পদের ওপর— ম/শ/৩
ট গোঠা শব্দের ওপর-- চোখ বোলাতে বোলাতে
আমরা/ ^এগোই। 'ঈশানের পুঞ্জ মেঘ অন্ধবেগে (/
ধেয়ে চলে আসে" পড়তে গিয়ে আমিরা wf.
ব্দ/ আস্ত-আস্ত শর্জগুলোর ওপর চেখ বুলিয়ে †/
,/ যাই। প্রুফ পড়ার অন্য নিয়ম—ছোটদের †/
†/ বানান করে-করে পড়ারমতন—ঈ-শা-নে-র #/
ঞ্জ/ে/ পু--ঞ্জমে-খ অ-ন্ধ-বে-গে ধে-য়ে চ-লে আ-সে। ঘ/
wf./ প্রুফ পড়ার সময় প্রত্যেকটি টাইপের ওপর প/×/
আলাদা করে নজর রেখে-রেখে পড়ে যেতে ×/
হবে।

বঁ/ তোমার ঠোঁটবাঁকানো দেখে মনে হচ্ছে, ন/ৎ/
(/ এইবার বলবে, 'বানান করে করে পড়ে
d/ যদি প্রুফ দেখিতে হয়, দরকার নেই ও-কাজ য়/
শিখে।'

প্রুফ পড়া

যাঁরা লেখেন, যাঁদের লেখা ছাপার হরফে প্রকাশিত হয়, তাঁদের প্রুফ-দেখা অভ্যাস করা উচিত। প্রুফ-দেখা অভ্যাস করলেই শেখা যায়। তিনটি কথা আছে। প্রুফ পড়া। বাঙলা টাইপের খুঁটিনাটিগুলি জানা। বানানের জ্ঞান, ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

এক ॥ প্রুফ পড়া আর বই পড়া এক জিনিস নয়। বই পড়ার সময় শব্দের ওপর—গোটা শব্দের ওপর—চোখ বোলাতে বোলাতে আমরা এগোই। "ঈশানের পুঞ্জ মেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে" পড়তে গিয়ে আমরা আস্ত-আস্ত শব্দগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে যাই। প্রুফ পড়ার অন্য নিয়ম—ছোটোদের বানান করে-করে পড়ার মতন—ঈ-শা-নে-র পু-ঞ্জ-মে-ঘ অ-ন্ধ-বে-গে ধে-য়ে চ-লে আ-সে। প্রুফ পড়ার সময় প্রত্যেকটি টাইপের ওপর আলাদা করে নজর রেখে-রেখে পড়ে যেতে হবে।

তোমার ঠোঁটবাঁকানো দেখে মনে হচ্ছে, এইবার বলবে, 'বানান করে করে পড়ে যদি প্রুফ দেখতে হয়, দরকার নেই ও-কাজ শিখে।'

যাচ্ছে। অবশ্য যতোগুলো নোতুন ডিসপ্লে টাইপ বেরিয়েছে তার সবগুলোকেই আমি সুন্দর বলতে নারাজ। কিন্তু 'বডি' টাইপ—বই-ছাপার টাইপ—তার বৈচিত্র্য কই ?

[এর কারণ কী ? টাইপ-তৈরির কারখানায় নোতুন নোতুন ছাঁদের বাঙলা টাইপ তৈরির তেমন উৎসাহ নেই কেন ?

প্রধান কারণ, বাঙলা বর্ণমালার সংখ্যাবাহুল্য আর জটিলতা। বাঙলায় বই ছাপতে গেলে টাইপ দরকার হয় ৫৬৩টি। হিসেব করে দেখা গেছে, ১৬ পাতার একখানা বই ছাপতে গেলে প্রেসকে প্রায় ৩০ সের টাইপ কিনতে হয়। কিন্তু ইংরিজি, ফরাসী, জার্মান, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, চেক ইত্যাদি যে-সব ভাষা রোমক বর্ণমালা ব্যবহার করে, সেই সব ভাষায় সবশুদ্ধু ১৫২টি টাইপেই যাবতীয় ছাপার কাজ চলে। আর রুশ, বুলগার, যুগোশ্লাভ প্রভৃতি যে-সব ভাষা কিরিলিক (Kyrillic) বর্ণমালা ব্যবহার করে তাদেরও মোটামুটি ১০০টা টাইপে কাজ চলে যায়। এই সব কারণে ঐ সব ভাষায় নিত্যনোতুন ছাঁদের টাইপ বেরোচ্ছে। কিন্তু বাঙলা যে-তিমিরে সেই তিমিরে !

[বাঙলা কি রোমক বর্ণমালায় লেখা বা ছাপা যায় না ?

এক-শো বার ছাপা যায়, খুব ভালোভাবে যায়। বাঙলা রোমক বর্ণমালা নিলে ছাপার খরচ যে কতো কমে যায় কী বলবো ! আর শুধু কি ছাপার সুবিধে ! বাঙলায় টাইপরাইটার হতে পারে, বাঙলায় টেলিগ্রাম পাঠানো যেতে পারে, খবরের কাগজের আপিসে বাঙলা টেলিপ্রিন্টার চলতে পারে—

[একটু নমুনা দেখান দেখি !

রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা রোমক বর্ণমালায় ছাপলে কেমন দেখায় দেখো—

1400 s**a**l

aji hate shatabarsa pare
ke tumi paricha basi **a**m**a**r kabit**a**kh**a**ni
kautuhalbhare,
aji hate shatabarsa pare.
aji naba basanter prabh**a**ter **a**nander
leshm**a**tra bh**a**g,
ajikar kono phul, bihanger kono gan,
ajikar kono raktar**a**g—
anur**a**ge sikta kari p**a**riba ki p**a**th**a**ite
tom**a**der kare
aji hate shatabarsa pare.

[বেশ সুন্দর হয় তো ! তবে জায়গা বোধহয় একটু বেশি নেয়। তা নিক, তবু চালানো উচিত।

নিশ্চিত থাকো, চলবে। তবে এখনি নয়। দেশকে বড়ো করার ইচ্ছে বাড়ুক, দেশকে উন্নত করার চাপ বাড়ুক, তখন চলবে।

[এতো ভরসা আপনি কোত্থেকে পান ?

চীনকে দেখে। চীনের জটিল চিত্রলিপি বহু হাজার বছরের

পুরনো। তার ওপর ওদের মায়া কম নয়। তবু দেশকে বড়ো করতে গিয়ে ওরা দেখছে, ঐ পুরনো জটিল চিত্রলিপি উন্নতির পথে একটা বড়ো বাধা। তাই তারা ঠিক করেছে, ঐ লিপিকে ত্যাগ করে রোমক লিপির মতো একটা সরল লিপি নিতে হবে। তাই নিয়ে লেখালেখি আলাপ-আলোচনা চলছে। আমার বিশ্বাস চীনকে দেখে।

যাই হোক, এখন ও-সব কথা থাক। নোতুন প্রুফ এসে গেছে। দেখো তো, দু প্রস্থ প্রুফ পাঠিয়েছে কি না।

[হ্যাঁ, দু প্রস্থই এসেছে। কিন্তু দু প্রস্থ পাঠাতে বলেছিলেন কেন ?

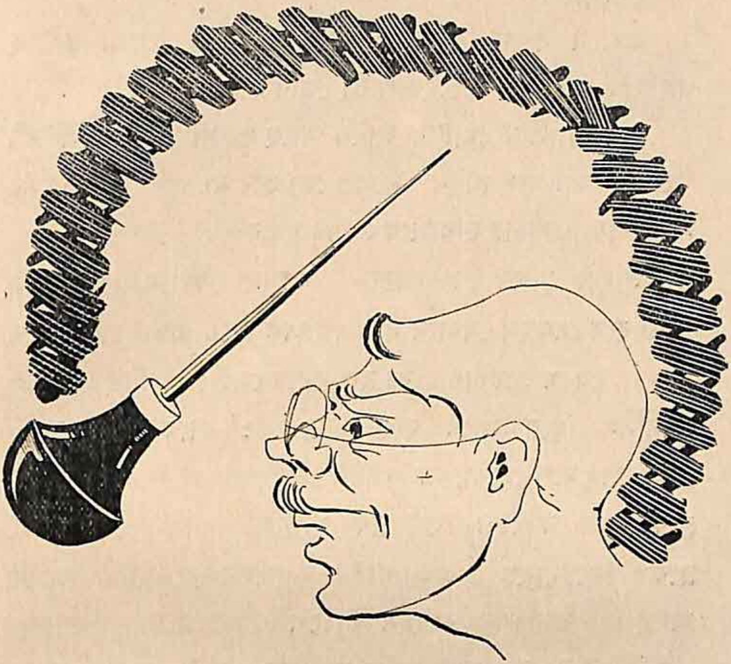
এই প্রস্থটা পড়া হবে, ভুলটুল কাটাকুটি যা এরই ওপর হবে। আর ঐ প্রস্থটা দিয়ে মেক-আপ দেখানো হবে।

[মেক-আপ কী ?

আমি একটা প্রশ্ন করি : এর পর প্রেসের কাজ কী ?

[এই প্রুফটা ফেরত গেলে আবার একটা নোতুন প্রুফ পাঠাবে।

বেশ, পাঠালো। তারপর ? সেই প্রুফে যদি একটিও কালির আঁচড় না পড়ে ? একটি ভুলও যদি না থাকে ? তখন ? ভাবো। ভাবো,—বইটা ছাপতে হবে, ১৬-পেজি ডবল ক্রাউন বই, ডবল ক্রাউন কাগজ মেশিনে চড়িয়ে সেই কাগজের ওপর ১৬টা পাতার ছাপ নিতে হবে।



বড্‌কিন—কম্পোজিটরের করেকশনের একটি যন্ত্র

[গাঁথা লাইনগুলোকে জমির পাতার মাপ অনুসারে আলাদা-আলাদা পাতায় ভাগ করে ফেলতে হবে।

এই তো, একেই তো বলে মেক-আপ। তোমার বইয়ের সাইজ হলো ১৬-পেজি ডবল ক্রাউন। পাতা আড়ে নামছে কতো ? ৩৩ এম। পাইকা টাইপ, ৬-প লেড ; ৩৩ এম-এ ক লাইন আসবে ? ২২ লাইন। ঠিক তো ?

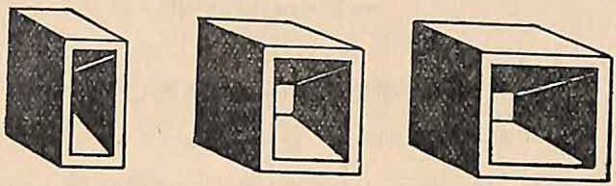
[সব ঠিক।

এখানে ছ গ্যালি প্রুফ আছে। বলতে পারো, এই ছ গ্যালিতে কটা ২২-লাইনের পাতা তৈরি হবে ?

[ছ গ্যালিতে মোট ক লাইন আছে তা না গুনে বলি কী করে ? আর শুধু লাইন গুনলেও তো হবে না, এই ক গ্যালির মধ্যে খান তিন-চার ছবির ব্লকও তো বসবে—

তাহলে গুনতে শুরু করো। যেখানে যেখানে ২২ লাইন পুরো হবে সেখানে সেখানে নীল পেন্সিল দিয়ে লম্বা দাগ টেনে দাও। যে-যে জায়গায় ছবির ব্লক বসবে সেই সেই জায়গায় লাল পেনসিল দিয়ে লিখে দাও: 'ব্লক ১' 'ব্লক ২' ইত্যাদি। ব্লকগুলো মেপে দেখো, ক লাইন টাইপের জায়গা প্রত্যেকটি ব্লকে দখল করছে। শুধু ব্লক মাপলেই কাজ ফুরোলো না, ব্লকের নিচে-নিচে দু-এক লাইন ক্যাপশন বা ছবির পরিচয় আছে। ক্যাপশন বর্জাইস টাইপে ছাপা হবে। তারপর দেখতে হবে, ব্লক যেন টাইপ-লাইনের গায়ের ওপর এসে না পড়ে। ব্লক আর টাইপের মাঝখানে কতোটা ফাঁক দেবে ? এক টাইপ-লাইনের সমান ফাঁক দাও। এই সব মেপেজুপে দেখো, প্রত্যেক ব্লকওয়ালা পাতায় কটা করে টাইপ-লাইন যাচ্ছে। এইভাবে ঐ প্রুফটা মেপেজুপে দাগাও দেখি।

হয়েছে ? দেখি কী দাঁড়ালো ? এই দেখো, এই তিনের পাতাটা একদম বাজে হয়েছে—আনাড়ির মতো মেক-আপ হয়েছে।



কোটেশন— ২ এম ৩ এম ৪ এম

বেশি ফাঁক দিতে হলে লেড না ফেলে কোটেশন ফেলা হয়

[কেন ?

পাতাটা শুরু হয়েছে একটা ভাঙা লাইন দিয়ে। চারটি মাত্র অক্ষর 'মনে হয়।'—একটা প্যারাগ্রাফের শেষ ভাঙা লাইন। এই রকম ভাঙা-লাইন-দিয়ে-শুরু পাতা বিচ্ছিরি দেখায়।

কী করা যায় ? দুটো উপায় আছে : এক, ঐ প্যারাগ্রাফের কোথাও চারটে-পাঁচটা অক্ষর বাদ দিয়ে দেওয়া, যাতে 'মনে হয়।' আগের লাইনে ঢুকে যায়। অথবা, প্যারাগ্রাফে আরো একটি বাক্য বা বাক্যাংশ জুড়ে দেওয়া, যাতে প্যারার শেষ ভাঙা লাইন পাতার দ্বিতীয় লাইন হয়ে যায়। চাক্ষুষ প্রমাণ দেখো—

সুন্দর করে বই ছাপান

এইভাবে পাতা শুরু করলে বিচ্ছিরি দেখায়।

কম্পোজিটরের হাতে আপসে মেক-আপ হতে দিলে এই রকম ভাঙা-লাইন-দিয়ে-শুরু পাতায় বই ভরে যাবে। এই ধরনের কুৎসিত পাতা এড়ানোর উপায় হলো

যদি গ্যালির ওপর হিসেব করে নেওয়া যায়, ঐ রকম পাতা এড়ানো যায়।

ঐ রকম পাতা এড়ানোর জন্যে লেখকের সঙ্গে পরামর্শ করে লেখা একটু-আধটু বাড়াতে-কমাতে হয়,

গদ্য-পদ্য-নাটক সব ধরনের বইতেই এইসব সমস্যা প্রায়ই ওঠে। তার মীমাংসার ভার পুরোপুরি প্রেসের ওপর ছেড়ে দিতে নেই। তুমি যে যোগ-বিয়োগ করে সমস্যার একটা সমাধান করলে (হয়তো লেখকের সঙ্গে পরামর্শ করেই), কম্পোজিটর কি সাহস করে তা করতে পারেন? তুমি যে ব্লকগুলোকে মনের মতো করে সাজালে, হয়তো ডামির থেকে একটু অদল-বদল করলে আর তাতে জিনিসটা আরো সুন্দর দাঁড়ালো, সেই অদল-বদল কম্পোজিটর করবেন কোন সাহসে? এইভাবে দেখে না দিলে তিনি ডামির মতো করেই পাতা সাজিয়ে যেতেন।

এইজন্যেই আপসে মেক-আপ হতে দিতে নেই—আলাদা একটা প্রুফে মেক-আপ দেখিয়ে দিতে হয়।

এসো, এখন সেই টাইপের খাতাটার ওপর চোখ বোলাও।

স্মল পাইকা—১০½ পয়েন্ট

ক্রীতদাসের যে-খাটুনির ওপর বিপুল ঐশ্বর্য আর সম্পদ গড়ে উঠেছিলো, কিছুকাল পরে সেই ক্রীতদাস-খাটুনিই সমাজের শিকড় ধরে টান দিলো। ব্যবসাবাণিজ্য থেকে মুখ ঘুরিয়ে সমস্ত ধনসম্পদ সবচেয়ে

স্মল পাইকা আধুনিক—১০½ পয়েন্ট

ক্রীতদাসের যে-খাটুনির ওপর বিপুল ঐশ্বর্য আর সম্পদ গড়ে উঠেছিলো, কিছুকাল পরে সেই ক্রীতদাস-খাটুনিই সমাজের শিকড় ধরে টান দিলো। ব্যবসাবাণিজ্য থেকে মুখ ঘুরিয়ে সমস্ত ধনসম্পদ সবচেয়ে লাভের

পাইকা—১২ পয়েন্ট

ক্রীতদাসের যে-খাটুনির ওপর বিপুল ঐশ্বর্য আর সম্পদ গড়ে উঠেছিলো, কিছুকাল পরে সেই ক্রীতদাস-খাটুনিই সমাজের শিকড় ধরে টান দিলো। ব্যবসাবাণিজ্য থেকে মুখ ঘুরিয়ে সমস্ত

পাইকা আধুনিক—১২ পয়েন্ট

ক্রীতদাসের যে-খাটুনির ওপর বিপুল ঐশ্বর্য আর সম্পদ গড়ে উঠেছিলো, কিছুকাল পরে সেই ক্রীতদাস-খাটুনিই সমাজের শিকড় ধরে টান দিলো। ব্যবসাবাণিজ্য থেকে মুখ ঘুরিয়ে সমস্ত ধনসম্পদ সবচেয়ে লাভের

স্মল পাইকা অ্যান্টিক

শিকড় ধরে টান দিলো। ব্যবসাবাণিজ্য থেকে মুখ ঘুরিয়ে সমস্ত ধনসম্পদ সবচেয়ে লাভের ক্রীতদাস-ব্যবসায় এসে জড়ো হতে লাগলো ; আত্মক্ষয়ী যুদ্ধবিগ্রহ তো লেগেই ছিলো।

পাইকা অ্যান্টিক

সমাজের শিকড় ধরে টান দিলো। ব্যবসাবাণিজ্য থেকে মুখ ঘুরিয়ে সমস্ত ধনসম্পদ সবচেয়ে লাভের ক্রীতদাস-ব্যবসায় এসে জড়ো হতে লাগলো ; আত্মক্ষয়ী যুদ্ধবিগ্রহ

১২ পয়েন্ট ভারতী

ক্রীতদাস-খাটুনিই সমাজের শিকড় ধরে টান দিলো। ব্যবসাবাণিজ্য থেকে মুখ ঘুরিয়ে সমস্ত ধনসম্পদ সবচেয়ে লাভের ক্রীতদাস-ব্যবসায় এসে জড়ো

১৪ পয়েন্ট পূরবী

ক্রীতদাসের যে-খাটুনির ওপর বিপুল ঐশ্বর্য আর সম্পদ গড়ে উঠেছিলো, কিছুকাল পরে সেই ক্রীতদাস-খাটুনিই সমাজের শিকড় ধরে টান দিলো। ব্যবসাবাণিজ্য থেকে মুখ ঘুরিয়ে সমস্ত ধনসম্পদ সবচেয়ে লাভের ক্রীতদাস-

গ্রেট—১৮ পয়েন্ট

ক্রীতদাসের যে-খাটুনির ওপর বিপুল ঐশ্বর্য আর সম্পদ গড়ে উঠেছিলো, কিছুকাল পরে সেই ক্রীতদাস-খাটুনিই সমাজের শিকড় ধরে টান দিলো। ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে মুখ ঘুরিয়ে সমস্ত ধনসম্পদ

১৮ পয়েন্ট ভারতী

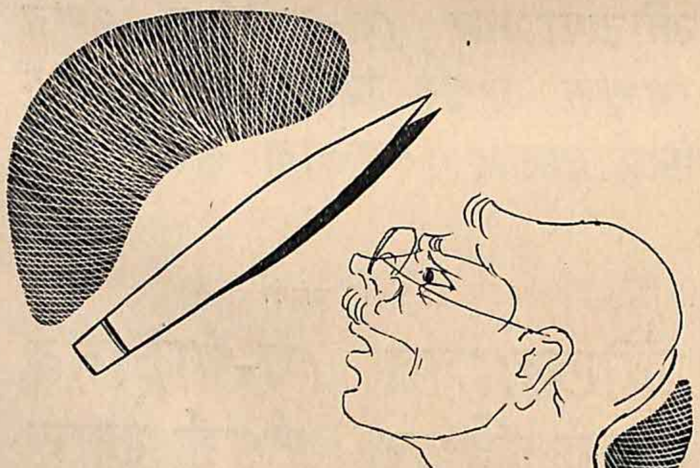
ক্রীতদাসের যে-খাটুনির ওপর বিপুল ঐশ্বর্য আর সম্পদ গড়ে উঠেছিলো, কিছুকাল পরে সেই

২৪ পয়েন্ট ভারতী

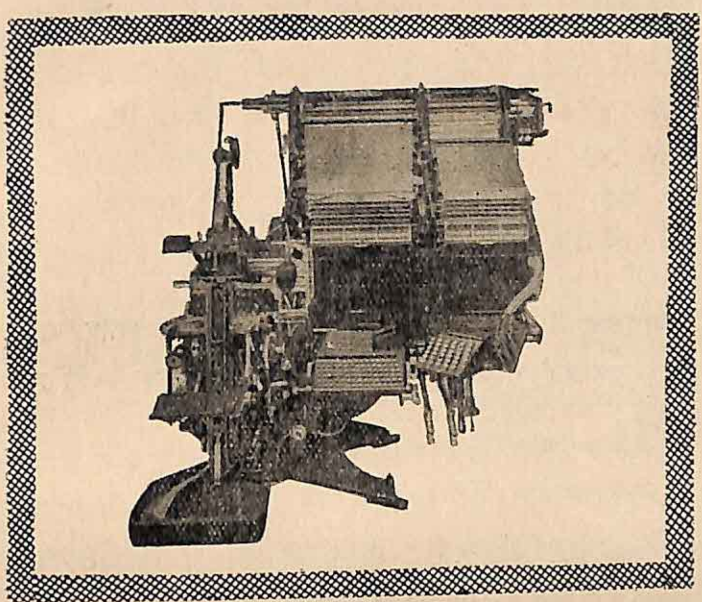
ক্রীতদাসের যে-খাটুনির ওপর বিপুল ঐশ্বর্য আর সম্পদ গড়ে উঠেছিলো,

ডবল গ্রেট—৩৬ পয়েন্ট

ক্রীতদাসের যে-খাটুনির ওপর বিপুল ঐশ্বর্য ও সম্পদ গড়ে উঠেছিলো,



চিমটে—কম্পোজিটরের করেকশনের আর-একটি যন্ত্র



চতুর্ভুজ

[আপনার টাইপের খাতায় একটা টাইপ দেখলাম না। কিন্তু 'যুগান্তর' পত্রিকায় রোজই দেখি। একে বলে,—কী যেন বলে ?

লাইনো-টাইপ

[লাইনো-টাইপের কথা একটু বলুন।

লাইনো-টাইপ একটি যন্ত্র, অর্থাৎ মেশিন। মেশিনে লাইন কম্পোজ হয়। কিন্তু আলাদা-আলাদা টাইপ টুকরো-টুকরো হয়ে কম্পোজ হয় না, গোটা লাইনটাই আস্ত এ ক টা সিসের খণ্ড হয়ে বেরোয়। চার জন কম্পোজিটর হাতে যা কম্পোজ করেন একটা লাইনো-টাইপ মেশিনের কম্পোজিটর একা ততোটা কম্পোজ করেন।

লাইনো মেশিনের কম্পোজিটরকে বলা হয় অ পা রে ট র। অপারেটর মেশিনের সামনে টুল পেতে বসেছেন। মেশিনের

সামনে কী-বোর্ড—টাইপরাইটারের কী-বোর্ডের মতো, এক-সার চাবি, প্রত্যেক চাবির ওপর হরফ লেখা। কী-বোর্ডের সামনে কপি। কপি দেখে-দেখে অপারেটর চাবি টিপছেন। চাবি টিপলেই ম্যাগাজিন থেকে ম্যাট্রিক্স্ বেরিয়ে আসে—

[ম্যাগাজিন কী? ম্যাট্রিক্স্ কী?

ম্যাট্রিক্স্ হলো টাইপের ছাঁচ—ছোটো-ছোটো পেতলের টুকরো, তার ওপর হরফ খোদাই করা আছে।

ম্যাগাজিন হলো ম্যাট্রিক্স্-এর ভাঁড়ারঘর। চাবি টিপলেই ম্যাগাজিন থেকে ঘুরন্ত বেল্ট্ বেয়ে ম্যাট্রিক্স্ বেরিয়ে পড়ে। বেরিয়ে পড়ে আসে অ্যাসেম্ব্লার বাকসে—সেখানে পরের পর জড়ো হতে থাকে। অ্যাসেম্ব্লার বাকস হলো লাইনো মেশিনের কম্পোজিং স্টিক। টাইপরাইটারে স্পেস ব্যান্ড্ আছে দেখেছো তো। স্পেস ব্যান্ডে চাপ দিলেই একটু ফাঁক পড়ে যায়। লাইনো মেশিনেও ঐ রকম স্পেস ব্যান্ড্ আছে। অ্যাসেম্ব্লার বাকসের একটু ওপরে একটা খুপরিতে স্পেস ব্যান্ড্গুলো থাকে। অপারেটর এক-একটা শব্দ কম্পোজ করেন আর স্পেস ব্যান্ডে চাপ দেন,—প্রত্যেক শব্দের পরে এক-একটা ইস্পাতের টুকরো পড়ে যায়, শব্দগুলো ফাঁক-ফাঁক হয়ে যায়।

অ্যাসেম্ব্লার বাকস যখন প্রায় ভরো-ভরো, ২ এম আন্দাজ খালি আছে, তখন একটা ঘণ্টা বেজে ওঠে। ঘণ্টা শুনে অপারেটরকে হিসেব করতে হবে: বাকি জায়গায় নোতুন একটা আস্ত শব্দ ঢুকবে কিনা। যদি না ঢোকে, তাহলে সম্ভব

হলে শব্দটাকে ভাঙতে হবে। ম্যাট্রিক্স্-এ আর স্পেস ব্যান্ড্-এ লাইন ভরতি হয়ে গেলে, অপারেটর একটা ছোটো হাতলে একটু চাপ দিয়ে দিলেন। ব্যস, অপারেটরের এক লাইনের কাজ শেষ। এবার তিনি আরেকটা লাইন কম্পোজ করতে শুরু করে দিলেন।

[অপারেটর হাতলে চাপ দিতে কী হলো ?

হাতলে চাপ দিতেই ম্যাট্রিক্স্গুলো স্পেস ব্যান্ড্-শুদ্ধ একটা মোল্ড্ হুইলে চলে গেলো।

মোল্ড্ হুইলের পেছনেই গলা সিসের পাত্র। সেই পাত্র থেকে সিসে এসে মোল্ড্ হুইলে পড়তে সিসের ওপর ম্যাট্রিক্স্-গুলোর ছাপ পড়ে গেলো—হরফের রূপ-গাঁথা একটা সিসের খণ্ড তৈরি হয়ে গেলো।

তৈরি হয়ে যেতেই, মোল্ড্ হুইল ঘুরে গেলো—শ্লাগটা, অর্থাৎ টাইপ-চিহ্নিত সিসের খণ্ডটা, হুইল থেকে বেরিয়ে এসে গ্যালিতে গিয়ে পড়লো। গ্যালিটা অপারেটরের বা পাঁশে মেশিনের সঙ্গে আঁটা।

[শ্লাগ তো তৈরি হলো, কিন্তু ম্যাট্রিক্স্ আর স্পেস ব্যান্ড্গুলোর কী হলো ?

শ্লাগ ঢালাই হওয়ার পর সেগুলো আবার নিজের নিজের জায়গায় ফিরে গেলো—ম্যাট্রিক্স্গুলো ম্যাগাজিনে, স্পেস ব্যান্ড্গুলো তাদের বাকসে।

ব্যাপারটা ভারি মজার। শোনো বলি। মোল্ড্ হুইল থেকে

স্পেস ব্যান্‌ড্‌গুলো আলাদা হয়ে তাদের জায়গায়, মানে মেশিনের অ্যাসেম্ব্‌লার বাকসের ঠিক ওপরে, চলে আসে। আর ঠিক সেই সঙ্গেই মেশিনের বাঁ দিকের ওপর কোণ থেকে একটা ক্রেনের মতো জিনিস ঝুঁকে নেমে এসে ম্যাট্রিক্‌স্‌গুলোকে চেপে ধরে ম্যাগাজিনের ওপর দিকে একটা ঘুরন্ত বার-এর কিনারে লাগিয়ে দেয়। এই খাঁজ-কাটা ডাণ্ডা বা বারটা ক্রমাগত ঘুরছে। ম্যাট্রিক্‌স্‌গুলোর এক দিকেও খাঁজ কাটা আছে। বার-এ ম্যাট্রিক্‌স্‌গুলো খাঁজে খাঁজে আটকে যায়। বারটা যখন ম্যাগাজিনের ওপর দিয়ে ঘুরতে থাকে তখন বার-এ আটকানো ম্যাট্রিক্‌স্‌গুলো ম্যাগাজিনে নিজের নিজের ঘরে আসতেই টুপ-টুপ করে সেখানে পড়ে যায়।

লাইনো মেশিনের মজা কী জানো। অপারেটর চাবি টেপার সঙ্গে সঙ্গে এক লাইন ম্যাট্রিক্‌স্‌ যখন অ্যাসেম্ব্‌লার বাকসে জমা হচ্ছে, তখন মোল্‌ড্‌ হুইল দ্বিতীয় একটা লাইনকে ছাঁচে ফেলে শ্লাগ বানিয়ে দিচ্ছে, আর তৃতীয় একটা লাইনের ম্যাটিক্‌স্‌ মোল্‌ড হুইল থেকে তাদের নিজের নিজের জায়গায় ফিরে যাচ্ছে। অর্থাৎ একসঙ্গে তিন লাইনের কাজ হচ্ছে।

এই জন্যেই লাইনো মেশিনের এতো স্পীড। একজন লাইনো অপারেটর চারজন কম্পোজিটরের সমান কাজ করেন। আমি তাই অপারেটরের নাম দিয়েছি চতুর্ভুজ। খবরের কাগজের আপিসে লাইনো মেশিনের তাই এতো কদর—রাত আড়াইটের

খবরও যে তুমি ঘুম ভেঙে উঠেই পাও, সে এই লাইনো মোশনেরই কল্যাণে।

[লাইনোর ছাপাটিও বেশ ঝরঝরে পরিষ্কার হয়। কেন বলুন তো।

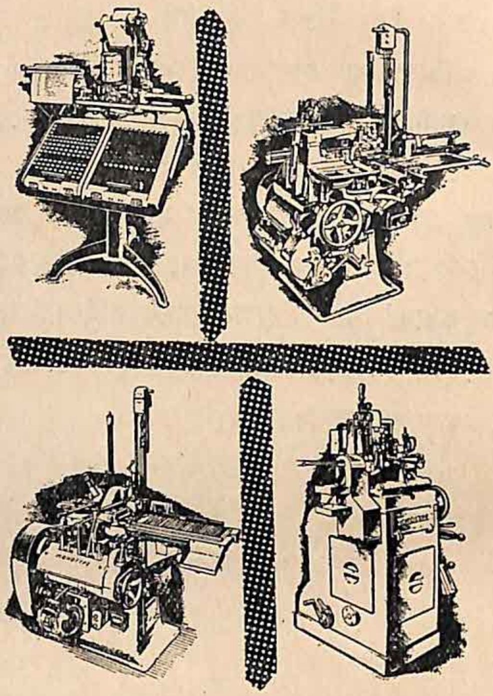
এও বুঝলে না এতোক্ষণে। লাইনোর টাইপ আস্ত এক-একটা লাইন যে। একটা লাইন তো একবারের বেশি দু বার ব্যবহার করা যায় না—ছাপা হয়ে গেলে গলিয়ে সিসে করে ফেলতে হয়। লাইনো টাইপে তাই প্রত্যেক বারই তুমি নোতুন টাইপ পাও, ছাপাও সেইজন্যে ঝরঝরে পরিষ্কার হয়।

বাঙলা বর্ণমালার জটিলতার কথা আগেই বলেছি। হাতে-কম্পোজের চারটে কেসে মোট কটা টাইপ থাকে মনে আছে তো? ৫৬৩টা। অনেক মাথা খাটিয়ে লাইনোতে এই সংখ্যাকে দাঁড় করানো হয়েছে ২৩১-এ। অর্থাৎ ২৩১টা ম্যাট্রিক্স্ হলেই হলেই বাঙলা কম্পোজ চলে। যিনি এতো মাথা খাটিয়ে বাঙলায় লাইনো-ছাপা সম্ভব করেছেন তাঁর কাছে বাঙালী চিরকৃতজ্ঞ। তাঁর নাম সুরেশচন্দ্র মজুমদার—এই কয়েক মাস আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

কিন্তু ম্যাগাজিনে এই ২৩১টা ম্যাট্রিক্সের সব-কটার জায়গা করা যায় নি। সেইজন্যে অপারেটরের ডান দিকে আছে একটা সাইড কেস—সেখানে বাড়তি ম্যাট্রিক্স্গুলো থাকে। সাইড কেসের ম্যাট্রিক্স্গুলো হাতে করে তুলে বসিয়ে দিতে হয়।

লাইনোয় বই ছাপাতে হলে প্রেস কপি একেবারে নিভু'ল-

ভাবে তৈরি করা উচিত—কমা-দাঁড়ির ভুলও অমার্জনায়। কেননা, লাইনোয় যদি কোনো লাইনে একটা কমাও বসাতে হয় তাহলে গোটা লাইনটাকেই আবার নোতুন করে কম্পোজ করতে হবে, যদি কোনো প্যারার প্রথম লাইনে একটি তিন অক্ষরের একটি শব্দও বসাতে হয় তাহলে হয়তো গোটা প্যারাটাকেই আবার নোতুন করে কম্পোজ করতে হবে। 'প্রুফে ঘসামাজা করবো'—এই ছেলেমানুষিকে লাইনোয় অন্তত বরদাস্ত করা চলবে না। প্রত্যেক অবিবেচক লেখক ও প্রকাশককে এ কথা পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া উচিত।



এই যে ছবিগুলো দেখছো, এগুলো মনোটাইপ মেশিনের ছবি। মনোটাইপ মেশিনও টাইপ-গাঁথার মেশিন। এ-মেশিনে প্রত্যেকটি হরফ, প্রত্যেকটি স্পেস আলাদা এক-একটা টুকরো হয়ে ঢালাই হয়— লাইনোর মতো পুরো একটা লাইন আস্ত একটা শ্লাগ হয়ে বেরোয় না।

মনোটাইপ মেশিনের দুটো অংশ : কী-বোর্ড আর কাস্‌টিং মেশিন। কী-বোর্ডের ওপরে একটা লাটিমে কাগজ জড়ানো থাকে। চাবি টিপলে সেই কাগজের ওপর ছোটো-ছোটো ফুটো হয়ে যায়।

এই ফুটো-ফুটো কাগজটাকে তারপর কাস্‌টিং মেশিনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই কাগজ থেকে টাইপ ঢালাই করা হয়।

এই দেখুন, আমাদের প্রথম ১৬-পাতার প্রুফ এসে গেছে। প্রুফের ওপরে লেখা : 'শেষ প্রুফ, ছাপার অনুমতি দেবেন।'

প্রথম ১৬-পাতা, দ্বিতীয় ১৬-পাতা—আমরা এ রকম করে বলি না। আমরা বলি, প্রথম ফর্মা, দ্বিতীয় ফর্মা, তৃতীয় ফর্মা। একটা আস্ত মাপের কাগজে যে ক-পাতা একসঙ্গে ছাপা হবে সেই ক-পাতা মিলে একটা ফর্মা। আমরা বলি, ৮-পেজি রয়্যাল ফর্মা, ১৬-পেজি ডবল ডিমাই ফর্মা।

[বুঝলাম। এখন থেকে ফর্মাই বলবো। এখন এই প্রথম ফর্মার শেষ প্রুফটা তো ভালো করে পড়তে হয়।

হ্যাঁ, শান্ত হয়ে খুব মন দিয়ে পড়তে হবে। একবার নয়, অন্তত তু বার পড়তে হবে। দেখতে হবে—

● ১ ● আগের প্রুফে যে-সব কাটাকুটি ছিলো সেগুলো সংশোধন করা হয়েছে কিনা।

● ২ ● ব্লকগুলো যেখানে-যেখানে বসানোর কথা, ঠিক সেখানে-সেখানে বসানো হয়েছে কিনা।

● ৩ ● ফোলিও লাইনগুলো ঠিক আছে কি না।

[ফোলিও লাইন কাকে বলে ?

পাতার যে-লাইনে পাতার নম্বর, বইয়ের নাম, অধ্যায় বা পরিচ্ছেদের নাম দেওয়া হয়, সেই লাইনকে বলে ফোলিও লাইন। ফোলিও লাইনে দেখতে হবে,—

পাতার নম্বর পর-পর আছে কিনা, বইয়ের নাম আর পরিচ্ছেদ বা অধ্যায়ের নাম, যেটা যে-পাতায় বসবে সেটা ঠিক

সেই পাতায় বসেছে কিনা। সাধারণত নিয়ম হলো, বইয়ের নাম পড়বে বাঁ-হাতি পাতায়, অধ্যায়ের নাম ডান-হাতি পাতায়। কিংবা বড়ো বইয়ে, অধ্যায়ের নাম বাঁ-হাতি পাতায়, অধ্যায়ের অন্তর্গত অংশের নাম ডান-হাতি পাতায়। যেমন,

১২ এযুগের ইতিহাস   চীনের মুক্তিসংগ্রাম ১৩

অথবা

৭৮ ফরাসী বিপ্লব   টেনিস কোর্টের শপথ ৭৯

ফোলিও লাইন পাতার মাথায়ও বসে, তলাতেও বসে। যখন তলায় বসে,—যেমন উপন্যাসে, কবিতায়—তখন শুধু পাতার নম্বর থাকে, বইয়ের নাম ইত্যাদি থাকে না।

[বুঝেছি। তারপর ?

● ৪ ● দ্বিতীয় ফর্মা থেকে দেখতে হবে,—আগের ফর্মার শেষ শব্দটার ঠিক পরের শব্দটা পরের ফর্মার ঠিক প্রথমে বসেছে কিনা। এখানে ভুল হলে বড়ো লজ্জা।

● ৫ ● প্রত্যেক লাইনের নিচে সমান লেড দেওয়া হয়েছে কিনা, ছবি আর লেখার মাঝখানে যতোটুকু ফাঁক থাকার কথা তা আছে কিনা, সাবহেডিংএর ওপর-নিচে যতোটুকু ফাঁক থাকার কথা তা আছে কিনা।

● ৬ ● প্রত্যেকটি পাতা আড়ের দিকের মাপে সমান আছে কিনা। প্রত্যেকটি পাতা এক মাপের হওয়া চাই—

একটুও গরমিল হলে ছাপার পর এ-পাতার লাইনগুলো ও-পাতার লাইনগুলোর ঠিক ওপর-ওপর পড়বে না,—হয় ওপরে উঠে যাবে, নয় নিচে নেমে যাবে।

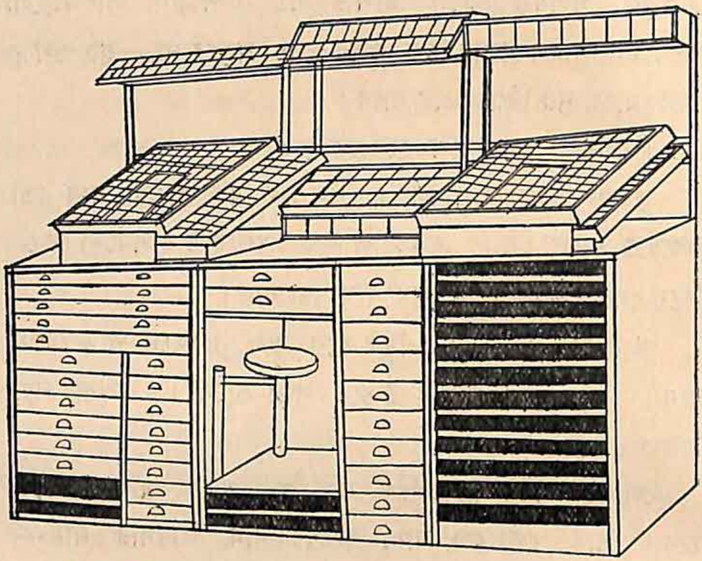
[ফুটরুল ফেলে মাপা হবে তো ?

ফুটরুল ফেলে মাপা যায়। এম-রুল যদি পাওয়া যায় তো সবচেয়ে ভালো হয়। একফালি শক্ত পিজবোর্ড মাপমতো কেটে নিয়ে সেটা ফেলে-ফেলেও মেপে যাওয়া যায়।

তারপর, ১৬টা পাতা স্থির হয়ে বসে একমনে পড়ে যেতে হবে। নিচু গলায় চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে পড়া ভালো। একবার নয়, অন্তত দু বার।

লেখার মধ্যে, সন-তারিখ যদি কিছু থাকে মিলিয়ে দিতে হবে। নাম—লোকের নাম, বইয়ের নাম, জায়গার নাম—মিলিয়ে দিতে হবে।

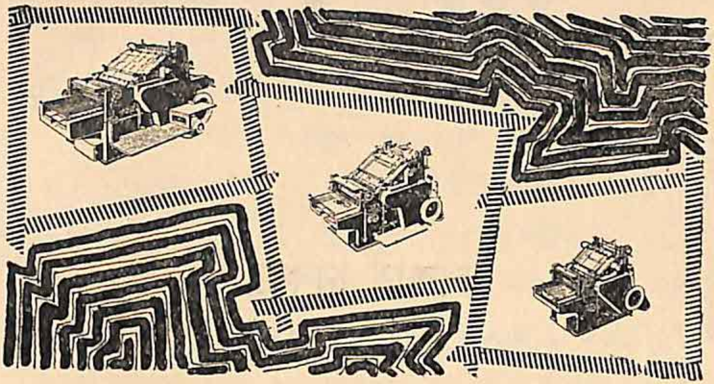
সব হয়ে গেলে, প্রুফের ওপর লিখে দিতে হবে: "ভুলগুলি সংশোধন করে ছাপুন"। কতো ছাপা হবে তাও লিখে দিতে হবে।



[এটা কি একটা কেস-স্ট্যান্‌ড্ ?

হ্যাঁ। তবে এদেশের নয়, বিদেশের। দেখো, সব ঢাকা-দেওয়া, কোথাও একটু ধুলো জমবে না। মাঝখানে ঘুরন্ত টুল—তার ওপর বসে কম্পোজিটর ইচ্ছেমতো হাত বাড়িয়ে যেটা যখন দরকার বার করে নিতে পারবেন।

[হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি !



চাকায় চাকায়

চাকায় চাকায়

আমাদের সেই প্রথম ফর্মাটা আজ মেশিনে চড়বে। ছাপা দেখতে যাবে নাকি ?

[দেখতে যদি দেয় তো চলুন না। দেখে-শুনে ভালো করে বুঝে আসা যাক।

দেখতে হলে চোখ চাই। শুনতে হলে কান চাই। বুঝতে হলে ?

[মাথা চাই। বলতে চান আমার মাথা নেই ?

জবাব দাও—ছাপা মানে কী ?

[ছাপা মানে ছাপ দেওয়া।

জবাব অতো সোজা নয়। প্রশ্ন করবো, কার ছাপ ? আবার প্রশ্ন হবে, ছাপ নিচ্ছে কে ? তৃতীয় প্রশ্ন হবে, ছাপ দিচ্ছে কে ?

[ছাপ—টাইপের। ছাপ নিচ্ছে—কাগজ। ছাপ দিচ্ছে—কালি।

ছাপা তাহলে এই তিনটে জিনিসের যোগাযোগ—

মূর্তি পট বর্ণ

আমাদের এই বই-ছাপার ব্যাপারে মূর্তি হলো—টাইপ আর ছবির ব্লক। পট হলো—কাগজ। বর্ণ হলো ছাপার কালি।

কাগজ কালিমাখা মূর্তির ওপর চেপে বসে মূর্তির ছাপ তুলে নিয়ে আসছে। মূর্তি তিন অবস্থায় থাকতে পারে, আর সেই অনুসারে ছাপ-তুলে-আনা তিন কায়দায় হতে পারে।

মূর্তি কোনো একটা প্লেট বা পাতের ওপর আঁকা থাকবে, হয় কোনো ধাতুর পাত (সিসে, দস্তা, তামা), নয়তো কাঠ, নয়তো পাথর। এক অবস্থায়, মূর্তিটা পাতের ওপর উঁচু হয়ে জেগে থাকে ; পাতের বাকি জায়গাটা মূর্তির থেকে নিচে নেমে থাকে। কালিটা লাগানো হয় পাতের-ওপর-উঁচু-হয়ে-জেগে-থাকা মূর্তিটার ওপর। কাগজ এই উঠে-থাকা, কালিমাখা মূর্তিটার ছাপ তুলে নিয়ে আসে। এই কায়দার ছাপাকে ইংরিজিতে বলে রি লি ফ প্রিন্‌টিং। ইস্কুলে রিলিফ ম্যাপ দেখেছো নিশ্চয়ই, যে-ম্যাপে পার্বত্য উচ্চভূমিকে সমভূমির চেয়ে উঁচুতে দেখানো থাকে। বাঙলায় এই কায়দার ছাপার নামকরণ করা যাক-- উচ্চতল মুদ্রণ।

দ্বিতীয় অবস্থায়, মূর্তিটা পাতের সঙ্গে একই সমতলে থাকে। এই কায়দার ছাপাকে ইংরিজিতে বলে প্লে নো গ্রা ফি ক প্রিন্‌টিং, বাঙলায় বলা যাক—সমতল মুদ্রণ।

"তেলেজলে মিশ খায় না" এই নিয়মটিকে আশ্রয় করে এই সমতল মুদ্রণের সৃষ্টি।

উদয়শঙ্কর 'রামলীলা' নাচ দেখাবেন। শহরের দেয়ালে দেয়ালে রঙিন পোস্টার পড়ে গেলো। সেই সব পোস্টার এই সমতল মুদ্রণের রীতিতে ছাপা।

[একটু বিস্তার করে বুঝিয়ে বলুন।

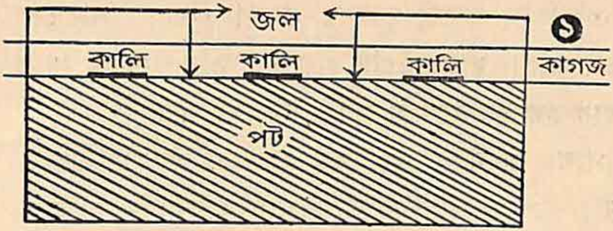
মূর্তিটা আঁকা হয় চুনাপাথরের পাটা কিংবা দস্তা বা অ্যালুমিনিয়মের পাতের ওপর। লেখা বা আঁকাটা হয় এক বিশেষ ধরনের তেলা কালি দিয়ে। শুকোলে কালিটা পাথরের ওপর কামড়ে শক্ত হয়ে লেগে থাকে।

এরপর যদি পাথরের গোটা পাটাকে জল দিয়ে ভিজিয়ে দাও, তেল-কালিতে আঁকা মূর্তিটা একটুও ভিজবে না, কেননা তেলে-জলে মিশ খায় না। জলটা তাহলে বসবে কোথায়? পাথরের শাদা, মূর্তি-না-আঁকা অংশের ওপর।

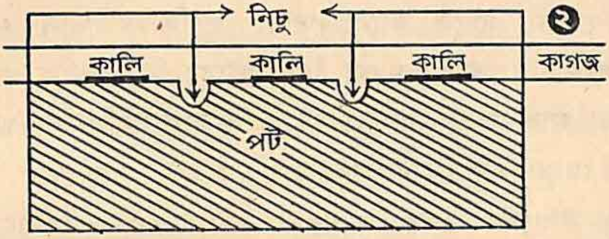
এইবার তুমি পাথরের ওপর তেলা-কালি-মাখা রোলার চালিয়ে দিলে। কালিটা থিতিয়ে বসবে মূর্তির ওপর, কেননা তেলে-তেলে মিশ খায়; কিন্তু শাদা ভেজা জায়গায় কালি ধরবে না, কেননা তেলে-জলে মিশ খায় না। এইবার কাগজ লাগিয়ে চাপ দাও, ছবি ফুটে উঠবে।

[কিন্তু কাগজটা যে শাদা জায়গায় জবজবে হয়ে ভিজে যাবে।

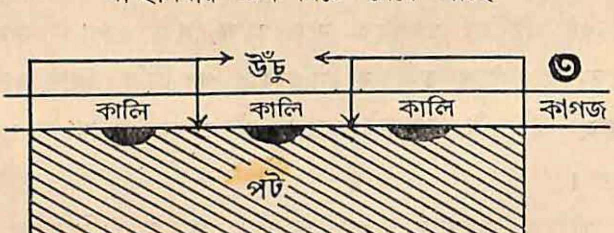
একটা কথা বলতে ভুলেছি। পাথরটাকে ভেজাবার পর তার ওপর বাতাস লাগানো হয়। বাতাসে জল উড়ে যায়, শুধু চুনাপাথরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলো একটু ভেজা-ভেজা হয়ে থাকে। তার ফলে, শাদা জায়গাটা জবজবে ভিজে হয়ে যায় না।



সমতল মুদ্রণ : ছাপবার অংশে তেলা কালি, না-ছাপাবার অংশে জল



উচ্চতল মুদ্রণ : ছাপবার অংশ ওপরে জেগে আছে, না-ছাপবার অংশ নিচে নেমে আছে



নিম্নতল মুদ্রণ : ছাপবার অংশ নিচে নেমে আছে, না-ছাপবার অংশ ওপরে জেগে আছে

এই হলো সমতল মুদ্রণের মোদ্দা কথা। আমাদের যুগে সমতল মুদ্রণের দারুণ উন্নতি হয়েছে। তবে পাথরের বদলে এখন ব্যবহার করা হয় দস্তা বা অ্যালুমিনিয়মের পাত।

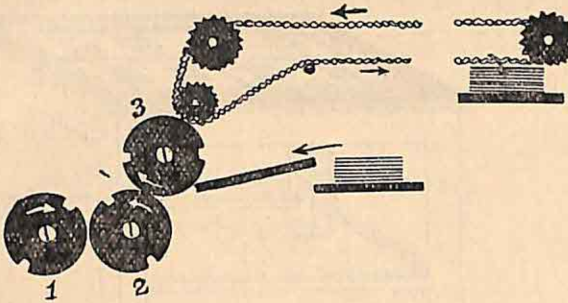
পাথর নমনীয় নয়, কিন্তু দস্তা বা অ্যালুমিনিয়মের পাত নমনীয়—তাদের বাঁকিয়ে নিয়ে গোল আকার দেওয়া যায়।

দস্তা বা অ্যালুমিনিয়মের পাতের ওপর মূর্তি এঁকে পাত-টাকে একটা সিলিন্ডারের গায়ে জড়িয়ে দেওয়া হয়। সিলিন্-ডার কেমন দেখতে জানো তো? পিচকিরির খোল একটা সিলিন্ডার। পাত-জড়ানো সিলিন্ডারের নিচে থাকে রবারে মোড়া আর-একটা সিলিন্ডার। মূর্তি-আঁকা সিলিন্ডার প্রথমে রবার-মোড়া সিলিন্ডারের ওপর ছাপ ফেলে। তার থেকে ছাপ পড়ে কাগজের ওপর—কাগজটা তৃতীয় একটা সিলিন্ডারে জড়ানো থাকে। অর্থাৎ, মূর্তি থেকে পটে ছাপটা সরাসরি পড়ছে না—পড়ছে আরেকটা পট ঘুরে এসে।

এই রীতির ছাপাকে বলে অ ফ সে ট ছাপা। জলরঙে বা তেলরঙে আঁকা ছবি, বা যে-ছবিতে খুব মিহি রেখার কাজ—সেই সব ছবি এই অফসেট ছাপায় কী সুন্দর যে খোলে তা কী বলবো।

আরেক কায়দার ছাপা আছে। তাকে ইংরিজিতে বলে ই ন্ ট্যা গ লি ও প্রিন্টিং, বাঙলায় বলা যাক নিম্নতল মুদ্রণ। এই কায়দায় ছাপার মূর্তিটা থাকে পটের—নিচে।

[ভারি অদ্ভুত তো !



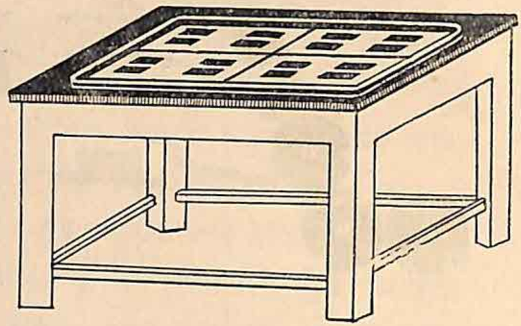
অফসেট ছাপার পদ্ধতি
(১) মূর্তি-আঁকা সিলিন্ডার, (২) রবার-মোড়া সিলিন্ডার,
(৩) কাগজ-জড়ানো সিলিন্ডার। শাদা কাগজ কীভাবে
ছাপ নিয়ে উঠে যাচ্ছে বুঝতে পারছো তো ?

মোটেই অদ্ভুত মনে হবে না যদি ছেলেবেলার দোলখেলার দিনগুলোর কথা মনে করো। আলু কুরে-কুরে 'গাধা' লিখে বন্ধুবান্ধবের পিঠে ছাপ দিতে না! সেও তো নিম্নতল মুদ্রণ।

[সত্যিই তো। এ-রকম কায়দায় বই ছাপা যায় ?

তা যায়। তবে এ-কায়দায় বইয়ের চেয়ে ছবি-টবিই ভালো খোলে।

[প্রেসে যদি যেতে হয় তাহলে এখনই তৈরি হওয়া উচিত নয় কি ?



এইটে প্রেসের মেশিনঘর। কোণের ঐ টেবিলটার কাছে চলো। ঐখানে আমাদের ফর্মার কাজ শুরু হয়েছে।

টেবিলটার পায়া চারটে ভালো সেগুন কাঠের, কিন্তু ওপরকার পাটাটা কিসের বলো তো ?

[ইস্পাতের মনে হচ্ছে।

মসৃণ ইস্পাতের। একে বলে ইম্‌পোজিং স্টোন। গ্যালি থেকে এই ইম্‌পোজিং স্টোনের ওপর—ইস্পাতের এই মসৃণ পাটাটার ওপর—আমাদের ফর্মার ১৬টা পাতা ফেলা হচ্ছে।

ফেলা হয়ে গেলো। এখন এই ১৬টা পাতাকে চারটে সারিতে সাজিয়ে ফেলা হবে ; এক-এক সারিতে চারটে করে পাতা। সাজাবার কায়দাটা দেখো :

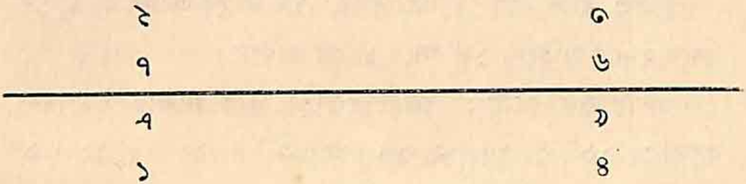
২ ৩

১ ৪

অর্থাৎ, কোলের দিকের সারির বাঁ কোণে ১, তার সোজা উলটো দিকের কোণে ২, ২-এর ডানদিকের কোণে ৩, ৩-এর সোজা উলটো দিকের কোণে ৪। ১ আর ২, আর ৩ আর ৪-এর মাথা মুখোমুখি।

[এমন উলটোপালটা করে সাজাচ্ছে কেন?

মুখ বন্ধ করে চোখ খুলে রাখো।



কী হলো বলো।

[৪-এর মাথায় ৫, ৩-এর তলায় ৬, ২-এর তলায় ৭, ১-এর মাথায় ৮। মাথাগুলো সব মুখোমুখি। কিন্তু উলটোপালটা করে সাজাবার মানে কী?

আমার প্রশ্নের জবাব দাও। ৮-এর ডাইনে যদি ৯ বসে,—১০, ১১, ১২ বসবে কোথায়?

[৮-এর ডাইনে ৯, ৭-এর ডাইনে ১০, ৬-এর বাঁয়ে ১১, ৫-এর বাঁয়ে ১২।

২	১৫	১৪	৩
৭	১০	১১	৬
৮	৯	১২	৫
১	১৬	১৩	৪

আবার প্রশ্ন করি : ১৩ যদি বসে ৪-এর বাঁয়ে—

[১৩ যদি বসে ৪-এর বাঁয়ে, ১৪ বসবে ৩-এর বাঁয়ে, ১৫ বসবে ২-এর ডাইনে, ১৬ বসবে ১-এর ডাইনে।

এবার অঙ্ক কসো : জোড়া-জোড়া পাতাগুলোর যোগফল কতো : ১৬+১, ১৫+২, ১৪+৩, ১৩+৪, ১২+৫, ১১+৬, ১০+৭, ৯+৮=কতো ?

[১৭, প্রত্যেকটারই যোগফল ১৭।

তাহলে আর ভয় নেই, পাতা ঠিকই সাজানো হয়েছে। হিসেব করে দেখতে হয়, ফর্মা যতো পাতার, পাশাপাশি জোড়া পাতার যোগফল তার থেকে ১ বেশি কিনা। তাহলেই বুঝতে হবে সাজানো ঠিক হয়েছে। ফর্মা যদি ৪ পাতার হয়, পাশাপাশি পাতার যোগফল হওয়া উচিত ৫। ফর্মা যদি ৮ পাতার হয়, পাশাপাশি পাতার যোগফল হওয়া উচিত ৯। এইভাবে বুঝতে হয়, সাজানো অর্থাৎ ইম্পোজিশন ঠিক হয়েছে কিনা।

[কিন্তু এ রকম এলোমেলো করে সাজানোর মানেটা কী ?

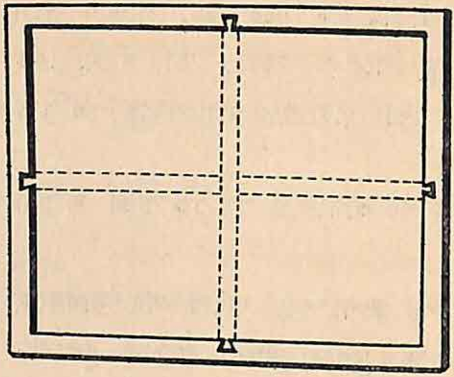
মানে খুব সোজা। পাতার এক পিঠে কটা পাতার ছাপ পড়বে? ১৬টা তো। দু পিঠে? ৩২টা। তার মানে, এক শীট কাগজে প্রত্যেক পাতার দুটো করে ছাপ পড়ছে—এপিঠে একটা, ওপিঠে আরেকটা।

[আচ্ছা তাহলে এক শীট কাগজে দু প্রস্থ ১৬ পাতা পাওয়া যাচ্ছে তো?

ঠিক ধরেছো। দু পিঠ ছাপা হয়ে যাবার পর কাগজকে মাঝখান-বরাবর কেটে নিলে দু টুকরো পাবে, প্রত্যেক টুকরোয় ১৬টা পাতা।

এক পিঠ ছাপা হয়ে গেলে, কাগজটাকে উলটিয়ে নিয়ে অন্য পিঠটা ছাপতে হবে। কাজেই, পাতাগুলোকে এমনভাবে সাজানো দরকার যাতে এ-পিঠের ১-নম্বর পাতার ঠিক উলটো পিঠে ও-পিঠের ২-নম্বর পাতা পড়ে, আর এ-পিঠের ২-নম্বর পাতার ঠিক উলটো পিঠে ও-পিঠের ১-নম্বর পাতা পড়ে; ৩-নম্বর পাতার উলটো ৪-নম্বর পাতা আর ৪-নম্বর পাতার উলটো ৩-নম্বর পাতা পড়ে। তাহলেই ছাপার শেষে কেটে নেবার পর যে দুটো টুকরো বেরোবে তাদের প্রত্যেকটাতেই পাতাগুলো পরের পর আসবে। এই কায়দায় সাজানোর নামই ইম্‌পোজিশন। ইম্‌পোজিশন মানে ইন পোজিশন অর্থাৎ ঠিক-ঠিক জায়গায় ফেলা।

ঐ দেখো, ঐ একটা লোহার ফ্রেম। ওকে বলে চেজ (chase)। চেজটার লম্বালম্বি আর আড়াআড়ি ঠিক মাঝখান দিয়ে দুটো 'বার' বা ডাণ্ডা লাগিয়ে চেজটাকে চারটে স্কোয়ার

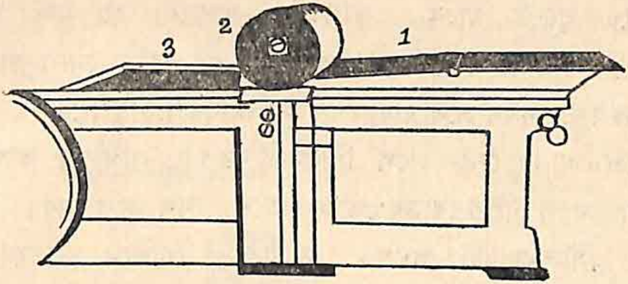


বা চতুষ্কোণে ভাগ করে ফেলা হয়েছে। আমাদের ফর্‌মাটা এবার এই চেজের মধ্যে বন্দী হবে।

চেজের এক-একটা চৌখোপে চারটে করে পাতা থাকবে। দেখো, চারটে করে পাতা বসবার পরেও প্রত্যেক চৌখোপের চার পাশে অনেকখানি করে ফাঁক থেকে যাচ্ছে। এই ফাঁকগুলোকে ভরতি করতে হবে কাঠ দিয়ে। ভালো সেগুন কাঠ চাই। হিসেব করে কাঠ বসাতে হবে—বইয়ের মার্জিন কেমন হবে তুমি বলে দিয়েছো। সেই হিসেবটা মাথায় রেখে মাপমতো কাঠ বসাবেন মেশিনম্যান—যেমন খুশি কাঠ দিয়ে ফাঁক ভরালে চলবে না।

মাপমতো কাঠ বসানো হয়ে গেলে চেজটাকে এঁটে ফেলতে হবে। চেজ-আঁটার ব্যবস্থা হলো, চেজের কিনার দিয়ে-দিয়ে 'কয়েন' (quoin) বসিয়ে চাপ দেওয়া। কয়েন হলো এক-এক জোড়া পেতলের বা ইস্পাতের পাত, দেখতে গজালের মতো, ভেতরে খাঁজ কাটা। খাঁজে-খাঁজে চাপ দিয়ে কয়েন-এর গজাল মুখগুলোকে দু দিকে ঠেলে দিলে কয়েন চেজের গায়ে টাইট হয়ে লেগে থাকে।

এইবার চেজে-আঁটা ফর্‌মাটা মেশিনে চড়বে। মেশিনের ধারে চলো।



(১) ফীড-বোর্ড, (২) সিলিন্‌ডার, (৩) টাইপ-বেড

মেশিনের মধ্যে এই-যে বড়ো ইস্পাতের পাতটা, এর নাম টাইপ-বেড। পাতা-আঁটা চেজটাকে এই টাইপ-বেডের ওপর রেখে ইস্‌ক্রুপ এঁটে দেওয়া হলো। মেশিন যখন চলবে তখন এই টাইপ-বেডটা এদিক-ওদিক যাওয়া-আসা করবে। টাইপ-বেডটা যখন মেশিনের পেছন দিকে যাবে তখন, আর যখন পেছন থেকে সামনের দিকে এগিয়ে আসবে তখন,—এই দু বারই কতকগুলো কালিমাখা রোলার টাইপ-বেডের ওপর কালি মাখিয়ে দেবে।

[কাগজ থাকে কোথায় ?

কাগজের গাদাটা থাকে এই বোর্ডটার ওপর—একে বলে ফীড-বোর্ড (feed-board)। এই ফীড-বোর্ড থেকে একখান একখান করে কাগজ লাগিয়ে দেওয়া হয় সিলিন্‌ডারের গায়ে। মেশিন চলতে শুরু করলে টাইপ-বেডটা যখন এদিক ওদিক যাওয়া-আসা করে তখন সিলিন্‌ডারটাও পাকে-পাকে বনবন

করে ঘুরতে থাকে। কাগজটা লাগানো হয় এই ঘুরতি সিলিন্ডারটার গায়ে। টাইপ-বেডটা এই ঘুরতি সিলিন্ডারটার নিচ দিয়ে যখন চলে যায় তখন সিলিন্ডারটা টাইপ-বেডের ওপর চাপ দেয়। সেই চাপে সিলিন্ডারের-গায়ে-লাগানো কাগজটা কালিমাখা টাইপ-বেডের থেকে টাইপের ছাপ তুলে নেয়।

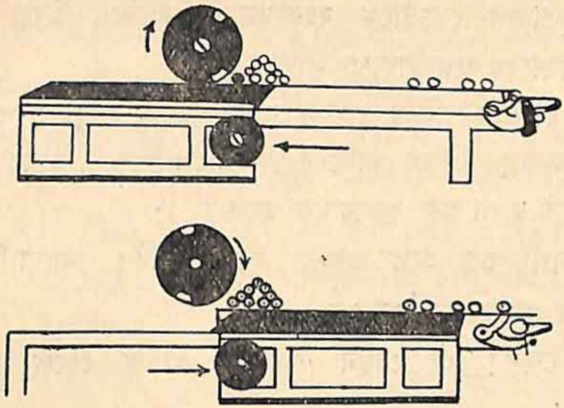
সিলিন্ডারটা ঘোরে। দু ধরনের মেশিনে দুই কায়দায় সিলিন্ডার ঘোরে। এক ধরনের মেশিনে সিলিন্ডারটা এক-পাক ঘুরে একটু থামে, তারপর আবার ঘুরতে শুরু করে, আবার থামে, আবার ঘোরে। একে বলে এক-পাক-ঘোরা সিলিন্ডার।

আরেক ধরনের মেশিন আছে—দু-পাক-ঘোরা সিলিন্ডার মেশিন। সিলিন্ডারটা এক-পাক ঘোরার পর থামে না, একটু উঠে গিয়ে উলটো মুখে ঘুরতে থাকে, আবার নেমে এসে সোজা মুখে ঘুরতে থাকে, আবার উঠে গিয়ে উলটো ঘোরা শুরু করে।

[কোনটা ভালো ?

যদি স্পীড চাও তাহলে দু-পাক-ঘোরা মেশিনকেই পছন্দ করতে হবে। একপাক ঘোরা, আবার থামা, আবার ঘুরতে শুরু করা—এই একবার থেমে শুরু করতে খানিকটা সময় নষ্ট হয় এক-পাক-ঘোরা মেশিনে। দু-পাক-ঘোরা মেশিনকে থামতে হয় না বলে তাড়াতাড়ি ছাপা হয়।

[সিলিন্ডারের গায়ে অতো সব কাগজ জড়ানো হয়েছে কেন ?



দু-পাক-ঘোরা মেশিন। ওপরের ছবি—সিলিন্ডার এখন টাইপ-বেডে চাপ দিচ্ছে, ছাপ উঠছে। নিচের ছবি—সিলিন্ডার এখন একটু ওপরে উঠে টাইপ-বেডকে ফিরে যাবার পথ করে দিচ্ছে। তীরচিহ্ন অনুসরণ করে টাইপ-বেডের যাওয়া-আসা লক্ষ্য করো।

সিলিন্ডার ইস্পাতে তৈরি। অতো ভারি ইস্পাতের জিনিসটা যদি সিসের টাইপের ওপর গিয়ে পড়ে, সিলিন্ডার বারকয়েক আনাগোনা করার পর একটা টাইপও আর আস্ত থাকবে না। সেইজন্যে কাপড় আর কাগজ দিয়ে সিলিন্ডারকে মুড়ে দিতে হয়। একে বলে সিলিন্ডারে প্যাকিং দেওয়া।

অবশ্য, সিলিন্ডারে প্যাকিং না দিয়ে এমনি চালালে টাইপগুলো সত্যিসত্যিই গুঁড়িয়ে যাবে না। কেননা, মেশিন বসানোর সময় এমনভাবে বসানো হয় যাতে সিলিন্ডারটা টাইপের থেকে সামান্য একটু উঁচুতেই থাকে। প্যাকিং লাগিয়ে

সিলিন্ডারের বেড়টাকে দরকারমতো বাড়িয়ে নিলে তবেই সিলিন্ডারের সঙ্গে টাইপের সংস্পর্শ হয়।

[দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কেবল বক্তৃতাই শুনছি। ছাপা শুরু হবে কখন ? ঐ যে মোটরের স্বইচ টিপে দিয়েছে, চাকা ঘুরছে, এই বার ছাপা শুরু করবে মনে হচ্ছে।

ছাপা শুরু হতে এখনও অনেক দেরি। আরো কিছুক্ষণ বক্তৃতা শুনতে হবে ধৈর্য ধরে।

[কেন ? ঐ দেখুন একখানা কাগজ ছেপে বেরিয়ে এলো।

এসো, একটু কাছে এগিয়ে এসো। সাদেক মিঞা, ট্রায়াল প্রুফটা একটু পেতে দিন না বোর্ডের ওপর।

চেয়ে দেখো, পছন্দ হচ্ছে ছাপা ?

[একটুও নয়। ছবিগুলি সব ভালো করে ওঠে নি, সব পাতায় সমান হয়ে কালি লাগে নি—এই রকম বিচ্ছিরি ছাপা হবে নাকি ?

মোটেই নয়। সাদেক মিঞা আমাদের ঝানু কারিগর। চোখ চেয়ে ওঁর হাতের কেরামতি দেখো আর কান পেতে আমার মুখের বক্তৃতা শোনো।

সমস্যাটা দাঁড়াচ্ছে কী ? একটা গড়ানে চাকায় কাগজ লাগিয়ে শোয়া ফর্মা থেকে ছাপ তুলে আনতে হচ্ছে।

কাগজ কি একসঙ্গে একই সময়ে গোটা ফর্মাটার ছাপ নিচ্ছে ?

না, তা নিচ্ছে না। গড়িয়ে গড়িয়ে ফর্মার যে-যে জায়গায় গিয়ে লাগছে সেই সেই জায়গার ছাপ নিচ্ছে।

এখন একটা কথা বুঝে দেখো। সিলিন্ডার কাগজটাকে জড়িয়ে চাপ দিচ্ছে ফর্মাটার ওপর, ক্রমান্বয়ে ফর্মার এক-এক অংশের ওপর, আর ফর্মার সেই সেই অংশ সেই চাপটাকে বাধা দিচ্ছে। এই চাপ-দেওয়া আর বাধা-দেওয়ার ঠেলাঠেলিতে ছাপ উঠছে। ঠিক তো ?

আরেকটা কথা বুঝে দেখো। তোমার এক হাতে যদি একটা আধমনী লোহার গোলা বসিয়ে দিই, তুমি রাখতে পারবে না, ফেলে দেবে। কিন্তু একটা আধমনী চালের বস্তা পিঠে ফেলে তুমি চেষ্টা করলে শেয়ালদা থেকে অন্তত বেলেঘাটার ব্রিজ পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারবে।

তার মানে কী ? বেশি জায়গা জুড়ে পড়লে চাপটা কম হয়, অল্প একটুখানি জায়গায় পড়লে বেশি হয়।

[কী বলবেন বুঝেছি। আপনি বলতে চান সিলিন্ডারটা ফর্মার সব অংশের ওপর সমান ওজনের চাপ দিচ্ছে না, কোথাও কম চাপ দিচ্ছে, কোথাও বেশি। কিন্তু তা কেন হবে ?

তাই তো হবে। সিলিন্ডারটার চাপের ওজন একই আছে ঠিকই। কিন্তু ফর্মার প্রত্যেকটি অংশ তো ঠিক একই রকম গড়নের নয়। কোথাও টাইপগুলো ঘন হয়ে আছে, কোথাও পাতলা হয়ে আছে। কোথাও পাতাভরতি ব্লক, কোথাও পাতা-ভরতি টাইপ। কোথাও ওপরের অংশে ক্ষয়ে-যাওয়া পুরনো

টাইপ, নিচের অংশে আনকোরা নোতুন টাইপ। কোথাও ব্লক তৈরির দোষে ব্লকটা টাইপের সঙ্গে একমাথা হয়ে নেই—নিচু হয়ে আছে, কোথাও হয়তো একটু উঁচু হয়ে আছে। সেইজন্যে সিলিন্‌ডারের চাপটা একই পরিমাণের থাকলেও ফর্‌মার প্রত্যেকটি অংশ সমান পরিমাণ বাধা দিচ্ছে না। যে-অংশের যে-রকম গড়ন সেই অংশ সেইরকম বাধা দিচ্ছে। এই বাধার ইতর-বিশেষ হচ্ছে বলে চাপেরও ইতর-বিশেষ হচ্ছে আর তার ফলে ছাপেরও ইতর-বিশেষ হচ্ছে। তাহলেই দেখো, এক-এক ফর্‌মায় রকম-রকম গরমিল। কেন? গরমিল হয় কেন? সমান ছাপ উঠছে না কেন? এইজন্যে যে, একই পরিমাণের চাপ ফর্‌মার ভিন্ন-ভিন্ন অংশের রকম-রকম গঠনের দরুন কম-বেশি ওজনে পড়ছে—কোথাও কম জায়গায় জোর চাপ পড়ছে, কোথাও বেশি জায়গায় অল্প চাপ পড়ছে।

এই গরমিলগুলোকে দেখেশুনে মিলিয়ে দিতে হয়। তাকে বলে 'মে ক-রে ডি'।

দেখো আমাদের ওস্তাদ সাদেক মিঞা কাঁচি আর আঠা নিয়ে কী করছেন। চেজের কয়েনগুলোকে ঢিলে দিয়ে, যে-ব্লকগুলো ভালো ছাপ নিচ্ছিল না সেই ব্লকগুলোকে ফর্‌মা থেকে বের করে এনে, ব্লকে চিপি দিচ্ছেন। চিপি দেওয়া কী? কাগজের বা পাতলা বোর্ডের মাপমতো টুকরো কেটে নিয়ে, তাতে আঠা মাখিয়ে ব্লকের নিচে সেঁটে দেওয়া। তাতে ফল হয় কী? ব্লকটা উঁচু হয়ে যায়, সিলিন্‌ডারের সঙ্গে তার সংস্পর্শটা ভালো-

ভাবে হয়, ছাপ পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ফরমার মধ্যে কোথাও কোথাও একটু পুরনো টাইপ আছে। পুরনো হলেই টাইপ একটু ভোঁতা হয়ে যায়, পুরনো টাইপের মাথা আশপাশের নোতুন টাইপের তুলনায় খুব সামান্য একটু নিচে থাকে। সেই পুরনো টাইপের নিচেও চিপি দিতে হচ্ছে।

নিচে চিপি দেওয়ার ইংরিজি নাম 'আন্‌ডার-লে'। এ ছাড়া আছে 'ওভার-লে'—ওপরে চিপি দেওয়া। কার ওপরে? সিলিন্‌ডারের প্যাকিং-এর ওপরে।

আমরা যতোক্ষণ কথা বলছি ততোক্ষণে সাদেক মিঞার চিপি-টিপি দেওয়া হয়ে গেছে। এইবার উনি আরেকটা কাগজে ছাপ নিচ্ছেন। ট্রায়াল প্রুফের সঙ্গে মিলিয়ে দেখো। তফাত বুঝছো?

[খুব বুঝছি। ব্লকগুলো সব পরিষ্কার উঠেছে।

শুধু কি তাই? বেশ নজর করে দেখো, আগেকারটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখো, সব পাতায় সমানভাবে কালি লাগছে কিনা। সাদেক মিঞা নিজেই খুব খুঁতখুঁতে লোক। যতোক্ষণ না নিজে ষোলো আনা সন্তুষ্ট হন ততোক্ষণ কাজ করে যাবেন। যখন বুঝবেন, নিখুঁত ছাপা দাঁড়িয়েছে তখন এক শীট ছাপা কাগজ অফিসে পাঠাবেন। অফিসে এক ভদ্রলোক আছেন—তিনি রীডার। তিনি—

● ১ ● তোমার কাটা শেষ প্রুফ মিলিয়ে দেখবেন সব ভুলগুলো সারা হয়েছে কি না।

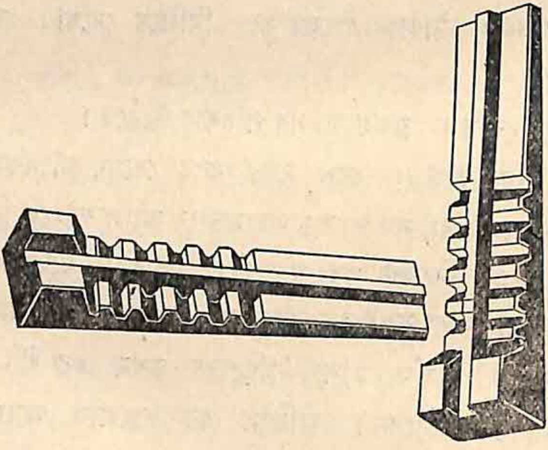
● ২ ● কোনো পাতায় ভাঙাচোরা টাইপ আছে কিনা।

● ৩ ● প্রত্যেক পাতার লাইনগুলো ঠিক তার উলটো পাতার লাইনগুলোর ওপর-ওপর পড়ছে কি না।

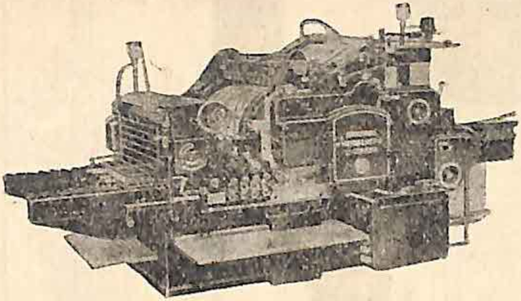
● ৪ ● ডামি মিলিয়ে দেখবেন, মার্জিন ঠিকমতো হয়েছে কিনা।

● ৫ ● কালি সব পাতায় সমান হয়েছে কিনা।

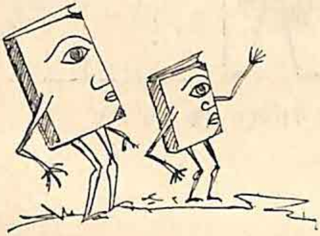
এইসব দেখে-শুনে তিনি ছাপবার অর্ডার দিলেই সুইচ অন হবে, মেশিনের চাকা চলতে শুরু করবে।

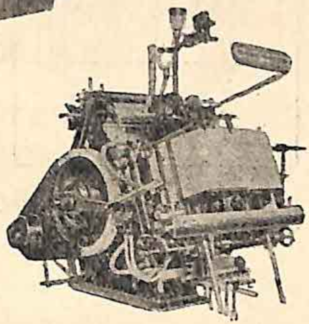


একজোড়া কয়েন—জোড়াকে খাঁজে খাঁজে জুড়ে চেজ আঁটা হয়।

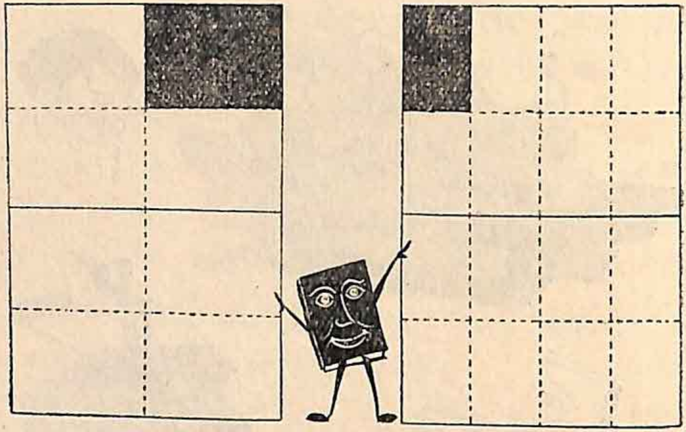




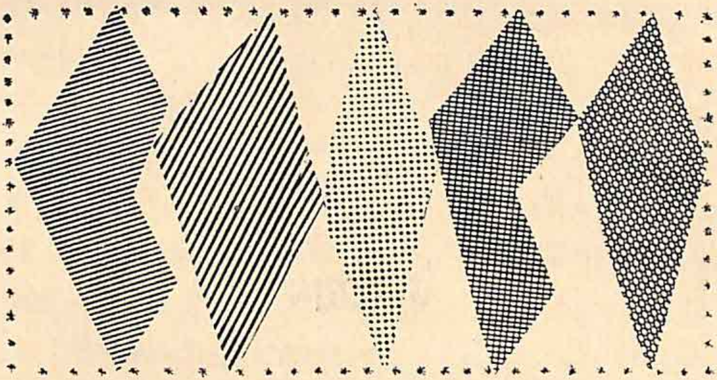




ওপরে অটোমেটিক হাইডেলবার্গ সিলিন্‌ডার মেশিন। নিচে অটোমেটিক হাইডেলবার্গ প্ল্যাটেন মেশিন। অটোমেটিক মেশিনে হাতে করে কাগজ লাগাতে হয় না—ঐ কাজটা যন্ত্রের সাহায্যে হয়।



'কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে'



টানটোন

টানটোন

[এর আগে ব্লকের কথা যখনই উঠেছে, 'পরে শুনো' বলে কথা চাপা দিয়ে গেছেন। আজ আর মুলতুবি রাখা চলছে না।

ক্যামেরায় ছবি তোলা যে ব্যাপার, ছবি থেকে ছাপার ব্লক তৈরিও মোটের ওপর সেই ব্যাপার।

ব্লকের দুই জাত। লাইন ব্লক, হাফটোন ব্লক।

[লাইন ব্লকের লক্ষণ কী ?

যে-ব্লক হাতে নিয়ে দেখবে, ব্লকের ছাপবার অংশ না-ছাপবার অংশের থেকে বেশ উঁচুতে জেগে আছে, না-ছাপবার অংশের ছোটো-ছোটো ফাঁকগুলোকে যেন কুরে-কুরে নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে আর বড়ো-বড়ো ফাঁক-গুলোকে একেবারে কেটে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে,—সেই ব্লককে লাইন ব্লক বলে চিনবে।

লাইন ব্লকে ছবির যে-নকল ওঠে আসল ছবির রূপের সঙ্গে তার হুবহু মিল থাকে। আসল ছবিতে লাইন যে-রকম

সরু-মোটা, ব্লকে অবিকল সেই রকম ওঠে। কোনো হেরফের হয় না।

[লাইন ব্লক হবে কী রকম ছবির ?

যে-সব ছবিতে কেবল লাইনের টানের প্রাধান্য—মোটা টান, পাতলা টান, মোটা ফুটকি, পাতলা ফুটকি, সেই সব ছবির লাইন ব্লক হবে। যেমন, কালিকলমে আঁকা ছবি, কাঠখোদাই ছবি, লিনোকাট ছবি, ছাপা পাতা ইত্যাদি।

[হাফটোন ব্লকের লক্ষণ কী ?

যে-ব্লক হাতে নিয়ে দেখবে, ব্লকের ওপরকার জমিটাকে প্লেন বলে চোখে লাগছে, ছাপবার আর না-ছাপবার অংশের মধ্যে যেন উঁচু-নিচু তফাত নেই, সেই ব্লককে হাফটোন ব্লক বলে চিনবে।

[উঁচু-নিচু নেই ? তাহলে টাইপের সঙ্গে ছাপা হচ্ছে কী করে ?

কথাটা কান দিয়ে শোনো। আমি বললাম, যে ন উঁচু-নিচু তফাত নেই। শাদা চোখে সে রকমই দেখায়। আসলে, তফাত আছে। ১৩১ পাতার ছবিগুলো দেখো। শাদা চোখে দেখলে দেখবে, ছবিগুলো আস্ত, আভাঙা, আফাঁকা জমি। ঐ ছবিগুলোকেই এবার একটা জোরালো ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখো। ফাঁক চোখে পড়ে তো ? ঐ ফাঁকগুলো আছে নিচুতলায় আর কালো-কালো ফুটকিগুলো আছে উঁচুতে।

[ব্লক কী করে তৈরি হয় জানতে ইচ্ছে করে।

প্রথমে লাইন ব্লক তৈরির ব্যাপারটা বলি। ক্যামেরায় ফোটো তোলার সময় প্রথমে যেমন একটা ফোটোগ্রাফিক প্লেটে ছবির নেগেটিভ তোলা হয়, ব্লক তৈরি করতে গিয়েও তেমনি ক্যামেরায় ছবির একটা নেগেটিভ তুলতে হয়। তারপর (১) একটা দস্তার পাতকে রাসায়নিক দিয়ে পরিষ্কার করে, (২) তার ওপর অ্যালবুমেন আর অ্যামোনিয়ম বাইক্রোমেট-এর দ্রব (সলিউশন) ঢেলে দিয়ে, (৩) দ্রবকে পাতের ওপর গরম করে শুকিয়ে (৪) নেগেটিভটাকে সেই দ্রব-মাখানো দস্তার পাতের ওপর রেখে, (৫) দুটোকে একটা ফ্রেমে এঁটে খুব জোরে চেপে,

তারপর, নেগেটিভ আর দ্রব-মাখানো দস্তার পাত—দুটোকেই ফ্রেমশুদ্ধু সূর্যের আলোর সামনে ধরা হয়।

[মেঘলা দিনে ব্লক হবে না ?

মেঘলা দিনে ব্যবহার করা হয় আর্ক ল্যাম্পের আলো।

[আলোয় ধরাতে কী হয় ?

আলো আর সলিউশনের ক্রিয়ায় একটা রাসায়নিক পরিবর্তন হয় : নেগেটিভের স্বচ্ছ অংশটা,—যেটার ভেতর দিয়ে আলো গেছে,—শক্ত হয়ে যায়।

দস্তার পাতটার ওপর নেগেটিভের জোর ছাপ পড়ে গেছে। পাতটাকে এখন ফ্রেম থেকে খুলে নিয়ে, তার ওপর এচিং ইঙ্ক বলে বিশেষ এক ধরনের কালি লাগিয়ে, পাতটাকে নাইট্রিক অ্যাসিডে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। অ্যাসিডে ভিজতে-ভিজতে পাতটার আলো-না-যাওয়া অংশটা আস্তে আস্তে গলে ক্ষয়ে যায়,

আলো-যাওয়া শক্ত অংশটা থেকে যায়—তার ক্ষয় হয় না।

অ্যাসিড থেকে তুলে, পাতটার ওপর এক রাসায়নিক পাউডার মাখিয়ে দেওয়া হয়। তারপর পাতটাকে গরম করা হয়। পাউডার গরমে গলে গিয়ে দস্তার জেগে-ওঠা মূর্তির ওপর বসে যায়।

পাতের মধ্যে যে-যে জায়গায় অনেকখানি করে না-ছাপবার অংশ, সেগুলোকে কেটে একেবারে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়।

লাইন ব্লক তৈরির সাড়ে পনেরো আনা কাজ শেষ। এইবার পাতটাকে একটা মাপসই শক্ত কাঠের টুকরোর ওপর চড়িয়ে চারদিকে পেরেক ঠুকে আটকে দিলেই—ব্লক রেডি।

[কাঠের ওপর চড়ানো হলো কেন ?

টাইপের সঙ্গে ছাপতে হবে না ? কাঠে চড়িয়ে পাতটাকে টাইপের সমান উঁচু করে দেওয়া হলো।

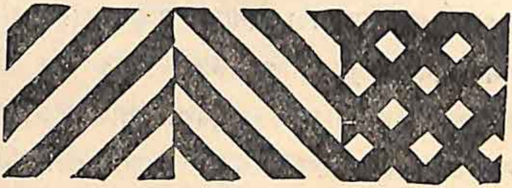
হাফটোন ব্লক তৈরির ব্যবস্থাও মোটামুটি ঐ রকম।

লাইন নেগেটিভ তোলবার সময়ে ছবিটাকে ক্যামেরার একেবারে সামনাসামনি আনা হয়। কিন্তু, হাফটোন নেগেটিভ তোলবার সময় ক্যামেরার লেন্স আর ছবির মাঝখানে একটা জালতি থাকে !

[কীসের জালতি ?

একজোড়া কাঁচ। দুটোকে গায়ে গায়ে লাগিয়ে দিলে একটা চৌখুপি জালতির মতো দেখায়। একে বলে স্ক্রীন।

[লেন্স-এর সামনে স্ক্রীন ধরলে কী হয় ?

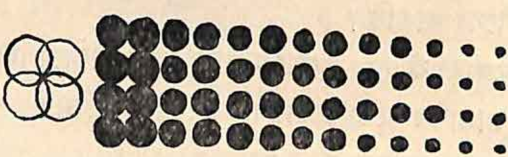


স্ক্রীন ব্যবহারের ফলে ছবিটার ভরাট জমিটা ভেঙে-ভেঙে ছোটো-বড়ো অসংখ্য ফুটকির সমষ্টিতে পরিণত হয়। ছবির যে-যে অংশ গাঢ় কালো, সেখানে সেখানে ফুটকিগুলো ছোটো-ছোটো, আর ঘেঁসাঘেঁসি। যেখানে যেখানে কম কালো, সেখানে সেখানে আরেকটু কম ছোটো-ছোটো, কম ঘেঁসাঘেঁসি। ছবির যেখানে যেখানে শাদা, সেখানে সেখানে ফুটকিগুলো বড়ো-বড়ো আর ফাঁকা-ফাঁকা ছড়ানো।

স্ক্রীন এক রকমের নয়, পাঁচ-ছ রকমের। ৫৫, ৬৫, ৮৫, ১০০, ১২০, ১৩৩, ১৫০, ২০০—মোটা থেকে মিহি অনেক রকমের স্ক্রীন আছে। ৫৫ স্ক্রীন মানে প্রতি ইঞ্চিতে ৫৫টা ফুটকি আছে, ২০০ স্ক্রীন মানে প্রতি ইঞ্চিতে ২০০টা ফুটকি আছে।

[কোন কাজে কোন স্ক্রীনের ব্যবহার ?

৪৫ স্ক্রীন—পোস্টার ছাপার জন্যে॥ ৬৫ স্ক্রীন—খবরের কাগজে ব্যবহার্য॥ ৮৫ স্ক্রীন—সস্তা, মেশিনে-চকচকে-করা

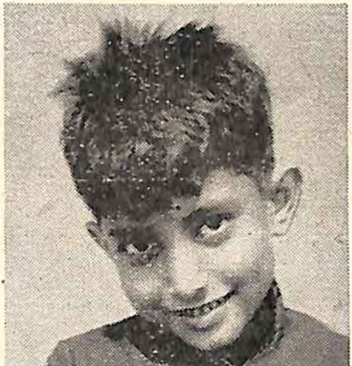




৫৫ স্ক্রীন



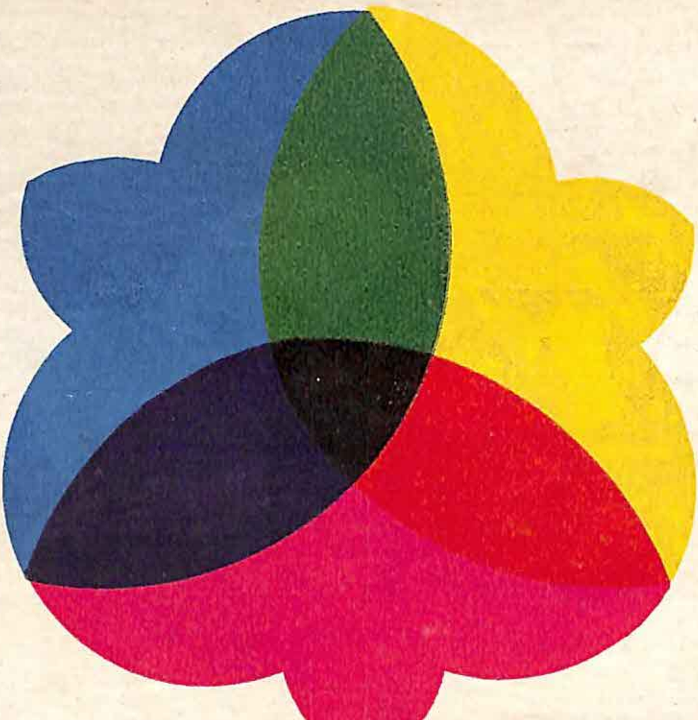
৬৫ স্ক্রীন

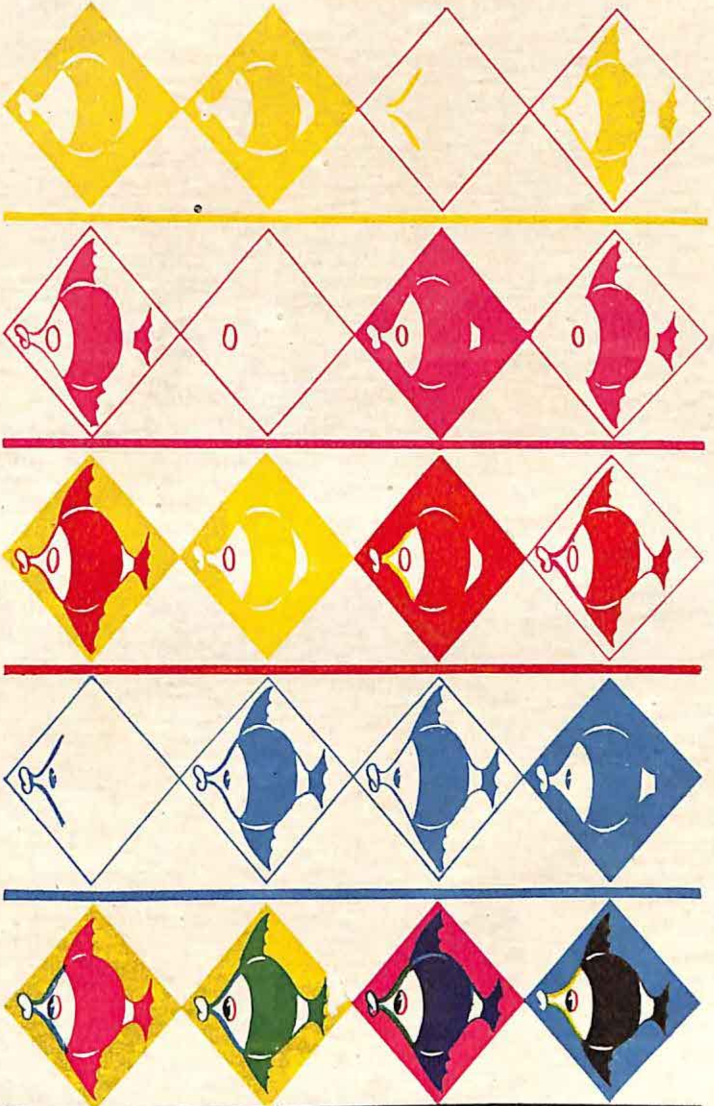


৮৫ স্ক্রীন



১০০ স্ক্রীন







কাগজের জন্যে ॥ ১০০স্ক্রীন—ইমিটেশন আর্ট কাগজের জন্যে ॥ ১২০ থেকে ২০০ স্ক্রীন—নানান ধরনের খাঁটি আর্ট পেপারে ব্যবহার্য ॥

মিহি স্ক্রীনের ব্লক সাধারণত তামার পাতে করা হয়—তাতে ব্লক টেকেও বেশি, ছাপাটাও মনের মতো হয়।

১৩৪ পাতার ছবিটা দেখো। ছেলেটার হাতের ঘুড়িগুলো, তার শার্টের হাতা আর বুক, প্যান্টের কাপড়ের নকশা—এগুলো কিন্তু হাতে-আঁকা জিনিস নয়। এগুলোকে বলা হয় 'টিন্‌ট্'। পুরোপুরি লাইনে আঁকা ছবিতে যদি বুঝে-শুনে টিন্‌ট্ লাগানো যায় তাহলে লাইন ব্লকেও কতকটা টোনের আভাস এনে দেওয়া যায়।

লাইন ব্লকে আরেকভাবেও টোনের আভাস এনে দেওয়া যায়। তাকে বলে হাফ-লাইনিং। হাফ-লাইনিং করতে হলে পাশাপাশি দাগ-কাটা স্ক্রীন ব্যবহার করতে হয়।

কম্‌বিনেশন ব্লকের কথাটাও জেনে রাখো। কম্‌বিনেশন ব্লক মানে একই ব্লকে লাইন আর টোনের মিশেল। কম্‌বিনেশন ব্লক তৈরি করার নিয়ম হলো, দুটো নেগেটিভ তৈরি করতে হবে—একটা লাইনের আর একটা টোনের। তারপর দুটো নেগেটিভকে একটা পাতে মাপমতো বসিয়ে দিলে কম্‌বিনেশন ব্লক তৈরি হবে।

ব্লক সম্বন্ধে আপাতত এই কথাগুলো বুঝে নাও। তারপর কাজে নেমে ব্লক নিয়ে যতো বেশি নাড়াচাড়া করবে ততো বেশি-বেশি শিখবে।

রঙের পরে রঙ

আজ রঙিন ব্লকের কথা পাড়া যাক।

রঙিন লাইন ব্লক, রঙিন হাফটোন ব্লক।

রঙিন লাইন ব্লক করতে চাও। মনে করো, তিন রঙ হবে—হলদে, লাল আর নীল। ছবিটার ওপর একটা পাতলা কাগজ এঁটে তোমাকে তিন রকম কালি দিয়ে দাগিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে কোথায় হলদে রঙ হবে, কোথায় লাল আর কোথায় নীল। এই কালি-দাগানো কাগজটাকে বলা হয় 'কলার চার্ট'। ব্লক-মেকার ছবিটার একটা নেগেটিভ তুলে নিয়ে তার থেকে তিনটে প্লেট তৈরি করবেন। তারপর কলার চার্টের সঙ্গে মিলিয়ে-মিলিয়ে প্লেট থেকে অন্য দুটো রঙের অংশ অ্যাসিডে খাইয়ে বাদ দিয়ে দিবেন। হলদের প্লেটে শুধু হলদে অংশটুকু থাকবে, লাল-নীল বাদ যাবে। এইভাবে তিনখানা আলাদা ব্লক তৈরি হবে, তিন বার আলাদা আলাদা ছেপে তিন রঙের ছবি পেয়ে যাবে।

[হাফটোনের রঙিন ছবি করতে চাই। মনে করুন, জলরঙে

আঁকা একটা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি। অনেক রঙ,—লাল, নীল, হলদে, বেগুনি, কমলা, সবুজ, কালো। কী করে সেই ব্লক হবে?

সেই জবাব পেতে গেলে একটু বিজ্ঞানচর্চা করতে হবে।

সূর্যের আলোয় সাতটি রঙ। একটা ত্রিশিরা কাঁচের ভেতর দিয়ে সূর্যের আলোকে ভেঙে নিলে পরপর পাই সাতটি রঙ : বেগুনি, নীল-বেগুনি, নীল, সবুজ, হলদে, কমলা, লাল। এর মধ্যে চারটি রঙ মিশেল রঙ : বেগুনি, নীল, হলদে, কমলা। বাকি তিনটি রঙকে বলা হয় 'প্রাইমারি কলার' বা প্রাথমিক রঙ। নীল-বেগুনি, সবুজ আর লাল হলো প্রাথমিক রঙ।

ব্লক-তৈরির কারখানায় ক্যামেরাম্যান ঐ নানারঙা ছবিটিকে নিয়ে ক্যামেরার সামনে ধরবেন, কিন্তু ক্যামেরা আর ছবির মাঝখানে একটা নীল-বেগুনি ফিলটার ব্যবহার করবেন। নীল-বেগুনি ফিলটার করবে কি—ছবির অন্য রঙগুলোকে আটকে রেখে শুধু হলদে রঙগুলোকে যেতে দেবে, নেগেটিভে শুধু হলদে রঙগুলোর ছাপ পড়বে। যে মিশেল রঙগুলোতে হলদের অংশ আছে,—যেমন কমলা রঙে আছে লালের সঙ্গে হলদে,—সেই হলদে-মিশেল রঙগুলো থেকে হলদের অংশের ছাপটুকু পড়বে।

এরপর ক্যামেরাম্যান ব্যবহার করবেন সবুজ ফিলটার, যার সাহায্যে ছবির শুধু লাল-রঙা আর লাল-মিশেল অংশগুলোর ছাপ নেগেটিভে ফুটবে।

এরপর লাল ফিলটার—ছবির নীলরঙা আর নীল-মিশেল ছাপ নেবার জন্যে। কটা নেগেটিভ তৈরি হলো?

[তিনটে। একটাতে শুধু হলদে, একটাতে শুধু লাল, একটাতে শুধু নীল।

তিনটে ব্লক তাহলে তৈরি হলো। তিনটে ব্লক আমি পর-পর ছাপাবো। প্রথমে হলদের ব্লক ছাপাবো। কাগজে পুরো হলদের ছাপ পড়বে, যেখানে হলদে-লাল মিশে কমলা রঙ হয়েছে সেখানকার হলদে ছাপও পড়বে, যেখানে হলদে-নীল মিশে সবুজ রঙ হয়েছে সেখানকার হলদে ছাপও পড়বে।

দ্বিতীয়ত ছাপাবো লালের ব্লক। তখন শুদ্ধ লালের ছাপও পড়বে, যেখানে লালে-হলদেয় মিশে কমলা রঙ, সেখানে কমলা রঙ ফুটে উঠবে, যেখানে লালে-নীলে মিশে বেগুনি রঙ হয়েছে সেখানকার লালের ছাপও পড়বে।

সবশেষে ছাপাবো নীলের ব্লক। শুদ্ধ নীলের ছাপও পড়বে, যেখানে নীলে-হলদেয় মিশে সবুজ রঙ, সেখানে সবুজ ফুটে উঠবে, যেখানে নীলে-লালে বেগুনি রঙ, সেখানে বেগুনি ফুটে উঠবে।

যেখানে তিনটে রঙ একটার ওপর একটা পড়েছে সেখানে পাবে কালো।

তিন রঙ ছাপা শেষ। এবার ছবিটা দেখো—আসল ছবির সঙ্গে কোনো গরমিল নেই।

এই হলো রঙিন হাফটোন ব্লক তৈরির আর সেই ব্লক ছাপার মোটামুটি কথা।



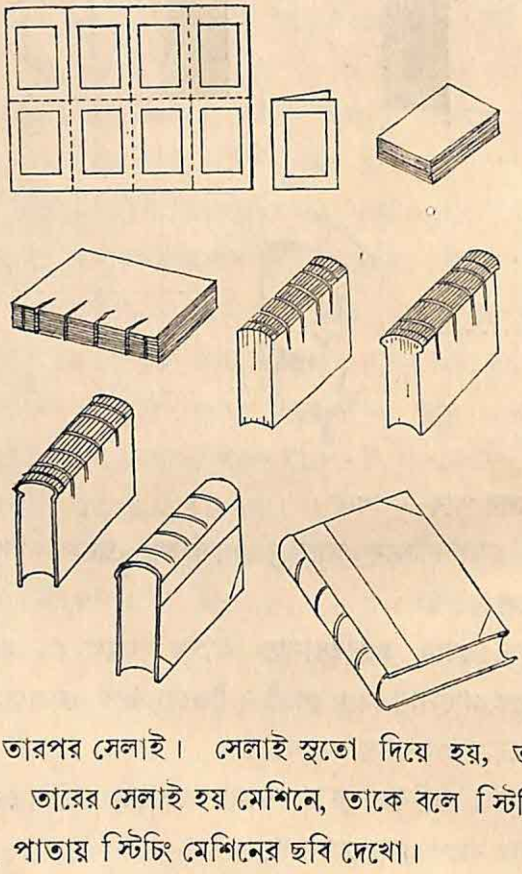
বই-ছাপার শেষ পর্বে—বাঁধাই।

ব্রডশীট কথাটা মনে আছে? আভাঁজা, প্রমাণ মাপের কাগজকে বলে ব্রডশীট।

ছাপাখানা থেকে দপ্তরিখানায় কাগজ এলো। দপ্তরি কাগজগুলোকে মাঝখান দিয়ে কেটে দু টুকরো করে ফেলবেন—প্রত্যেক টুকরোয় এক-প্রস্থ ১৬ পাতা।

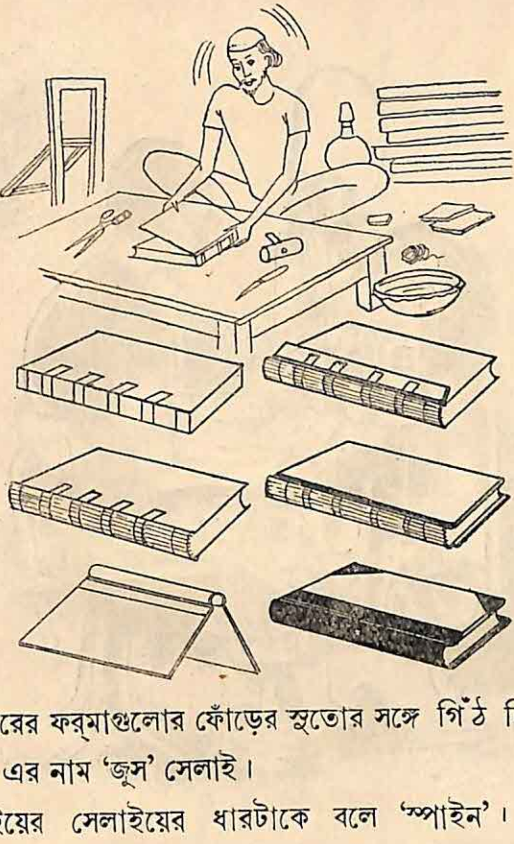
তারপর সেই দু-টুকরো-করা কাগজগুলোকে ভেঁজে-ভেঁজে বইয়ের পাতার মাপে এনে ফেলা হলো।

তারপর ভাঁজা ফর্মাগুলোকে পর-পর গোছ করে রাখা—দপ্তরিখানায় এই কাজটাকে বলে 'মিসিল তোলা'।



তারপর সেলাই। সেলাই সুতো দিয়ে হয়, তার দিয়েও হয়। তারের সেলাই হয় মেশিনে, তাকে বলে স্টিচিং মেশিন। ১৪২ পাতায় স্টিচিং মেশিনের ছবি দেখো।

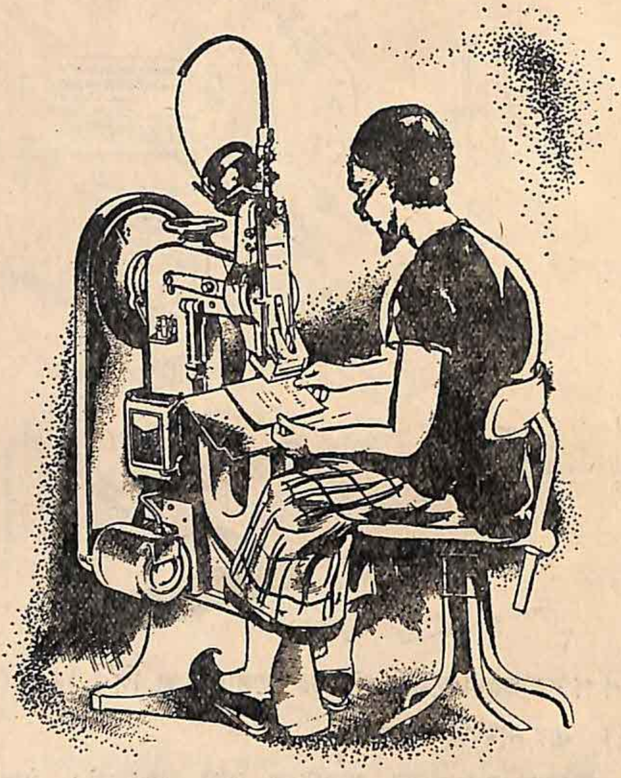
আমাদের দেশে বড়ো বই বাঁধাইয়ে সুতোর সেলাই-ই চলে বেশি। পত্রপত্রিকা বা ছোটোখাটো বই তারে সেলাই করা হয়। সুতোর সেলাই বেশ সময়সাপেক্ষ কাজ। প্রত্যেকটি ফর্মার মাঝখান দিয়ে দুটো-তিনটে ফোঁড় দিয়ে সুতো বের করে



এনে পরের ফর্মাগুলোর ফোঁড়ের সুতোর সঙ্গে গিঁঠ দিয়ে দিতে হয়। এর নাম 'জুস' সেলাই।

বইয়ের সেলাইয়ের ধারটাকে বলে 'স্পাইন'। বাঙলায় বলে 'পুট'। মোটা-মোটা বইয়ে সেলাই করার পর স্পাইনটাকে গোল করে দেওয়া হয়।

গোল করে দেওয়াতে বইটা দেখতেও বোধহয় ভালো হয়, বারবার নাড়াচাড়াতে জখমও হয় কম।



এরপর বোর্ড লাগানো। বোর্ডের ওপর ছাপা কাগজ বা রেক্সিন কিংবা চামড়া সেঁটে দেওয়া—ব্যস, বই তৈরি হয়ে গেলো।

ছবিগুলো মন দিয়ে দেখো, নিজে পরিষ্কার বুঝতে পারবে।

আমরাও হতে পারি

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

এক : বিদ্যুৎ-বিশারদ : দেবীদাস মজুমদার

দুই : মুদ্রণ-বিশারদ : অশোক ঘোষ

তিন : মোটর এঞ্জিনিয়ার : দেবীদাস মজুমদার

চার : বিমান-বিশারদ : দেবব্রত বসু

পাঁচ : রেডিও-বিশারদ : জ্যোতির্ময় দে

ছয় : বীক্ষণ-বিশারদ : কমলেশ রায়

সাত : ফোটোগ্রাফার : কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ইত্যাদি ইত্যাদি

আমরাও হতে পারি—শুধু তাই নয়, আমাদেরও হতে হবে। কেননা আজ আমাদের দেশ একটা প্রকাণ্ড যুগ-পরিবর্তনের মুখোমুখি এসে পৌঁছেছে—হাজার বছরের পুরোনো যে-অচল খোঁটায় আমাদের ভাগ্য বহুদিন বাঁধা পড়েছিলো তা উপড়ে ফেলে বিদেশী শাসন-মুক্ত এই দেশকে শিল্পে, ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে হবে। আর তাই যন্ত্রকে ভয় পেয়ে বসে থাকা চলবে না,—হাতের কাজকে ছোটো মনে করবার, ঘৃণা করবার, দিন নয় আর। তাই এই গ্রন্থমালার পরিকল্পনা। যাঁদের দিয়ে বইগুলি লিখিয়েছি তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের বিভাগে বিশেষজ্ঞ। তাঁদের বলেছি : আপনাদের ওই জ্ঞানের ঐশ্বর্যই আজ একটা ঋণ হয়েছে—দেশের কিশোর-কিশোরীদের কাছে ঋণ। আপনারা যা জেনেছেন, শিখেছেন তা সহজ করে ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে, যাতে যন্ত্র-কৌশলের নানা বিভাগে ওরা সত্যিই আগামীকালের বিশারদ হয়ে ওঠে।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়